POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ
مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ
يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

এবং তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের কিনারায় ছিলে তখন তিনি তোমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করিলেন। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।

(আলে ইমরান: ১০৪)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly
BADAR Qadian
Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা
29

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 18জুলাই, 2019 14যুল কাদা 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

আকাশ ও পৃথিবীর সাক্ষ্য কোন কৃত্রিম বা কল্পিত খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয় না, বরং সেই চিরঞ্জীব ও স্বয়ংসম্পূর্ণ খোদার অস্তিত্ব প্রকাশ করে যিনি স্থিতিশীল ও স্থিতিদাতা। ইসলাম এই খোদাকেই পেশ করে। কুরআনের সমস্ত শিক্ষার সাক্ষ্য প্রকৃতির নিয়মের প্রতিটি কণার দ্বারা উচ্চারিত হয়। এর শিক্ষা ও কল্যাণরাজি কোন কল্পকাহিনী নয় যা মিটে যাবে।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

ইসলামের খোদা

ইসলামের খোদা এমন দুর্বোধ্য খোদা নন, যাকে উপলব্ধি করতে বিবেক-বুদ্ধি ত্যাগ করতে হবে বা প্রকৃতির খাতা যাঁর অস্তিত্বের কোন প্রমাণ বহন করে না। বরং ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রকৃতির নিয়মের পাতায় এমন বিপুল নিদর্শন একত্রিত হয়ে আছে যা স্পষ্টভাবে খোদার অস্তিত্বের জানান দেয়। এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তু রাস্তার সেই মাইল ফলক বা গলির প্রারম্ভে লাগানো ফলকের ন্যায় খোদার অস্তিত্বের দিকে চালিত করে, যেভাবে ফলকগুলি সেই সড়ক, মহল্লা বা শহরের নাম নির্দেশ করে। আর তা কেবল সেই অস্তিত্বকেই প্রকাশ করে না, বরং সুনিশ্চিত প্রমাণ দেয়। আকাশ ও পৃথিবীর সাক্ষ্য কোন কৃত্রিম বা কল্পিত খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয় না, বরং সেই চিরঞ্জীব ও স্বয়ংসম্পূর্ণ খোদার অস্তিত্ব প্রকাশ করে যিনি স্থিতিশীল ও স্থিতিদাতা। ইসলাম এই খোদাকেই পেশ করে। পাদ্রী ফান্ডর, যে কিনা সর্ব প্রথম ভারতে এসে ধর্মীয় বিতর্ক সভায় অংশগ্রহণ করেছিল এবং ইসলামের প্রবল সমালোচনা করেছিল, সে নিজেই মিযানুল হক পুস্তকে প্রশ্ন হিসেবে লিখেছে যে, যদি এমন কোন দ্বীপ অবশিষ্ট থাকে যেখানে ত্রিত্ববাদের শিক্ষা পৌঁছয় নি, তবে কি সেখানকার বাসিন্দাদের পরকালে ত্রিত্ববাদের ভিত্তিতে বিচার হবে? অতঃপর স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তিনি নিজেই এর এই উত্তর দিচ্ছেন যে, তাদের বিচার হবে একত্ববাদের ভিত্তিতে। এর থেকে অনুধাবন কর যে, যদি প্রত্যেক বস্তুতে একত্ববাদের ছাপ না পাওয়া যেত, আর ত্রিত্ববাদ একটি কল্পিত মতবাদ না হত তবে একত্ববাদের ভিত্তিতে মানুষের বিচার কেন করা হত?

একত্ববাদ প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুতে মুদ্রিত আছে

বস্তুতপক্ষে মানুষের প্রকৃতিতেই اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى (আল আরাফ: ১৭৩) মুদ্রিত আছে। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং জগতের সমস্ত বস্তুর সঙ্গে ত্রিত্ববাদের কোন সামঞ্জস্য নেই। পানির একটি বিন্দুকে পর্যবেক্ষন কর, সেটি গোলাকার, ত্রিভুজাকৃতির নয়। এর থেকেও স্পষ্ট হয় যে, একত্ববাদ প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুতে মুদ্রিত আছে। ভালভাবে পর্যবেক্ষণ কর, জলবিন্দুর গোলাকার রূপ একত্ববাদেরই প্রমাণ বহন করে। কেননা এটি কোনও দিকে ঝুঁকে পড়ে না। ত্রিভুজাকার কোন একটি নির্দিষ্ট দিকে আবদ্ধ থাকে। অনুরূপভাবে অগ্নিশিখার প্রতি লক্ষ্য কর। এটিও শঙ্কুকাকৃতির ও গোলাকার। এর থেকেও একত্ববাদের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়। পৃথিবীর উদাহরণ দেখ। ইংরেজদেরকেই জিজ্ঞাসা কর এর আকৃতি কিরূপ? তারা বলবে এটি গোলাকার। মোটকথা, বাস্তবজগতে আমরা যা কিছু গবেষণা করে দেখব, সেখানেই দেখব একত্ববাদের প্রমাণ বেরিয়ে আসছে। আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে বলেছেন- اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ (আলে ইমরান: ১৯১) তাঁর জন্য আকাশ ও পৃথিবী দলিল-প্রমাণে পরিপূর্ণ।

একটি প্রাজ্ঞ প্রবাদ আমার অত্যন্ত পছন্দের। এতে বলা হয়েছে যে, যদি পৃথিবীর সমস্ত বই-পুস্তক সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়, তথাপি ইসলামের খোদার অস্তিত্ব বজায় থাকবে। কেননা তিনি ত্রিত্ববাদের তিন খোদার একজন বা কোন কল্পকাহিনী নন। প্রকৃতপক্ষে কোনও বাস্তবতা তখনই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে গণ্য হতে পারে যখন এর সত্যতা অন্য কোন বিশেষ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল থাকে না। অর্থাৎ যদি পূর্বের বিষয়টি যদি না থাকে তবে পরের বিষয়টিও থাকে না। কল্প-কাহিনী না অন্তরে প্রভাব ফেলতে পারে, না পারে প্রবৃত্তিতে। বস্তুতঃ এই কল্প-কাহিনীগুলি ততদিনই জীবিত থাকে যতদিন পন্ডিত ও পাদ্রীরা তাদের স্মরণ করাতে থাকে। কিন্তু অবশেষে তা ত্রুটিপূর্ণ মুদ্রণের ন্যায় চিরতরে মুছে যায়।

কুরআনের শিক্ষার সাক্ষ্য প্রকৃতির নিয়মের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন: اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ○ فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ○ لَّا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ বরং এগুলি সবই প্রকৃতির পাতার সিন্দুকে রক্ষিত আছে। কুরআন করীম একটি গোপন পুস্তকে রয়েছে- একথার অর্থ কি?এর অস্তিত্ব কেবল কাগজ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সেটি রয়েছে একটি গোপন পুস্তকে যাকে প্রকৃতির পুস্তক বলা হয়। অর্থাৎ কুরআনের সমস্ত শিক্ষার সাক্ষ্য প্রকৃতির নিয়মের প্রতিটি কণার দ্বারা উচ্চারিত হয়। এর শিক্ষা ও কল্যাণরাজি কোন কল্পকাহিনী নয় যা মিটে যাবে। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৩-৫৬)

১২৫ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০১৯ সালে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিতব্য জলসা সালানার জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৭, ২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর ২০১৯ (যথাক্রমে- শুক্র, শনি ও রবিবার)। আশিসমণ্ডিত এই জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন আর পাশাপাশি দোয়াও করুন যেন আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করেন। এই জলসা সালানা যেন সার্বিকভাবে সফল ও আশিসমণ্ডিত হয়, এবং সৎ প্রকৃতির মানুষের হেদায়েতের কারণ হয়, সেই উদ্দেশ্যে দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা। (নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৮ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর

আমি জামাত আহমদীয়ারস্থানীয় মানুষজনদেরকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই যাদের পরিশ্রমে এই দৃষ্টিনন্দন মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। আামি একথা জেনে বড়ই আনন্দিত যে এখানকার স্থানীয় আহমদীরা ফিলোডেলফিয়াকে নিজেদের বাসস্থান মনে করে। এটিও আমাকে আনন্দ দেয় যে, এখন আপনাদের কাছে সুন্দর একটি জায়গা আছে যেখানে আপনারা নিজেদের মত করে ইবাদত করতে পারবেন। এই শহরের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ধর্মীয় স্বাধীনতা এখানকার নীতিমালার অন্যতম বিষয়। আমরা যে কোন জাতি ও বর্ণের মানুষ হই না কেন এই শহরে প্রত্যেকে স্বাগত। এই নীতির উপর ভিত্তি করেই শহরের ভিত রচিত হয়েছিল।

মেয়র সাহেব বলেন: যেরূপ আপনারা অবগত আছেন যে, এই শহরে বহু ধর্ম ও জাতির মানুষ নিজেদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান মেনে চলে। তাই যেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বাস, সেখানে এই মসজিদটি এই শহরটিকে আরও দৃঢ়তা দান করবে। মসজিদের উদ্বোধন আমাদের একতা ও সমন্বয়ের প্রতীক। মুসলমানেরা আমেরিকার সভ্যতা ও সংস্কৃতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ,তাই বর্তমানে আমাদের দেশের পরিস্থিতি বিচার করে আমি আপনাদের বলতে চাই যে, ফিলোডেলফিয়া শহরে সকল মুসলমান সম্মানীয় আর তারা এখানে নিরাপদ।

আমার মতে খোদা তা'লা স্বয়ং এখানে এই মসজিদটি নির্মাণ করিয়েছেন। আমরা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন সেগুলির সমাধান সম্ভব ইতিবাচক চিন্তাধারার মানুষ ও আদর্শ দ্বারা, যারা আমাদের ছোটদেরকে সঠিক পথের দিশা দিতে পারেন। আমরা যদি পরস্পর মিলে কাজ করি, পরস্পরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি আর পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে পারি যে, আমরা একসাথে থাকতে পারি, তবে অচিরেই আমাদের নিজেদের এবং শিশুদের শিক্ষার সমস্যা দূর হবে।

নিজের ভাষণের শেষে তিনি হুযুর আনোয়ার (আই)-এর হাতে ফিলোডেলফিয়া শহরের চাবি তুলে দেন।

মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য সম্মানীয় ডুইট এভানস নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। ২০১৬ সালে তিনি নির্বাচিত হন। নিজের ভাষণে তিনি বলেন: এই মহান শহর ফিলোডেলফিয়ায় হুযুর আনোয়ারকে স্বাগত জানানো আমার জন্য সম্মানের বিষয়। এই শহর হল ভ্রাতৃসুলভ ভালবাসা ও ভগিনী সুলভ স্নেহের শহর। ফিলোডেলফিয়া প্রশাসনের পক্ষ থেকে এক মুসলমান সম্প্রদায়কে বলতে চাই যে, আপনাদের শান্তির বার্তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। মুষ্টিমেয় মার্কিনবাসীর পক্ষ থেকে সম্প্রতি ইসলাম বিরোধী কিছু কথাবার্তা শোনা গিয়েছে। আমি কিন্তু আপনাদেরকে বলতে চাই যে এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছে। আপনাদের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও উগ্রতা প্রদর্শনের বিরুদ্ধে আমরা লড়াইয়ে পাশে আছি। মার্টিন লুথার কিং বলেছেন- 'কোন একটি স্থানে অন্যায় হওয়া প্রত্যেকটি স্থানের ন্যায়ের জন্য বিপদজ্জনক।'

তিনি বলেন:আমি আপনাদের শান্তির বার্তাকে কেবল সমীহের দৃষ্টিতেই দেখি না, বরং আপনারা যে নিজেদের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন, সেটিও আমাকে আভিভূত করেছে। যেমন 'এনুয়াল ব্লাড ড্রাইভ' প্রকল্প, আপনাদের পক্ষ থেকে প্রদর্শিত দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা আর শান্তি প্রচেষ্টা। এই সব কাজের জন্য আমি আপনাদেরকে সাধুবাদ জানাই। মেয়রের উপস্থিতিতে আমি একথা ব্যক্ত করতে চাই যে, আমরা আপনাদের পাশে আছি। আপনারা এই কাজে একা নন। সবশেষে হুযুর আনোয়ারকে আরও একবার এই মহান শহরের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি।

পেনস্লোভেনিয়ার গভর্ণর নিজের রেকর্ড করা ও লিখিত বার্তা উপস্থাপনের জন্য ইফি লাসন ও জুলিয়া পার্কারকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তারা বার্তা পাঠ করে শোনান। ভদ্রমহিলা বার্তা পাঠের পূর্বে বলেন: আসসালামো আলাইকুম। আমি সেই শহরের পক্ষ থেকে হুযুর আনোয়ারকে স্বাগত জানাচ্ছি যা ভ্রাতৃসুলভ প্রেম ও ভগিনীসুলভ স্নেহের' জন্য সুবিদিত। আমি এখানে গভর্ণরের বার্তা পাঠ করে শোনাবো। এর পূর্বে আমি জামাত আহমদীয়াকে একারণে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে তারা মসজিদ নির্মাণের জন্য ফিলোডেলফিয়াকে নির্বাচন করেছে আর প্রতি বছর হারিসবার্গ-এ জলসার আয়োজন করে। ধন্যবাদ।

এরপর এফি লাসেন সাহেব গভর্ণরের নিম্নোক্ত বার্তা পড়ে শোনান। আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আহুত হওয়া আমার জন্য সম্মানের বিষয়। মসজিদ উদ্বোধনের জন্য আমি আপনাদেরকে সাধুবাদ জানাই। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের এক্য ও সংহতি থেকেই প্রমাণিত যে, আপনাদের নেতা সম্মানীয় হযরত মির্যা মসরূর আহমদ সাহেবএকজন বিশ্বনেতা। কমন ওয়েলথ অফ পেনোস্লোভিয়ার যথারীতি প্রথম মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের জন্য হুযুর আনোয়ারকে অভ্যর্থনা জানানো আমার জন্য সম্মানের বিষয়। আহমদীয়া মুসলিম কমিউনিটির নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বিশ্ব-মানবাধিকারের প্রসার, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা, নারীদেরকে স্বনির্ভর ও শিক্ষিত করে তোলার মত পদক্ষেপগুলিকে আমরা কমন ওয়েলথে অত্যন্ত সমীহের দৃষ্টিতে দেখি।

এরপর জুলিয়া পার্কার সাহেবা বার্তা উপস্থাপন করে বলেন: হুযুর আনোয়ার এবং সমগ্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে ইসলামী শিক্ষার প্রতি সম্পৃক্ততা, শান্তি ও সহনশীলতার বার্তা প্রচারের জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছি। ফিলোডেলফিয়ায় এই নতুন মসজিদ সংলগ্ন অঞ্চলে কমিউনিটির মানুষদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে আপনাদের দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপ অত্যন্ত কার্যরী ভূমিকা পালন করছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আহমদীয়া মুসলিম কমিউনিটির নেতৃত্বের তত্ত্বাবধানে নির্মিত এই মসজিদ সমগ্র কমন ওয়েলথে শান্তি, আশা ও ঐক্যের আলো প্রমাণিত হবে।

গভর্ণরের পক্ষ থেকে পেনস্লোভিয়ার সমস্ত জনগণের পক্ষ থেকে আমি মির্যা মসরূর আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ আল খামিসকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করছি। আর আমাদের কমনওয়েলথে শান্তি, ঐক্য ও মানবতার নীতি বিকাশের জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামাত ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অতিথিদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এই স্মরণীয় মূহুর্তটিতে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। (টম উল্ফ)

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) ভাষণ প্রদান করেন (ইংরেজি)।

তাশাহুদ তাউয ও তাসমিয়া পাঠের হুযুর আনোয়ার (আই) বলেন: সম্মানীয় সকল অতিথিবৃন্দ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আপনাদের সকলের উপর কৃপা ও করুণা বর্ষিত হোক। সর্বপ্রথম আমি অতিথিদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা আন্তরিকতার সাথে আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন আর আমাদের সঙ্গে আনন্দের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন যেখানে আমরা শহরে নিজেদের মসজিদ উদ্বোধন করছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি জীবনের এক চিরাচরিত সত্য যে, মানবজাতি এমন এক সৃষ্টি যাদের অস্তিত্ব সামাজিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক সমন্বয় ছাড়া সম্ভবপর নয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রেরর উর্দ্ধে মানবজাতি হিসেবে আমরা এক অভিন্ন জাতি। কাজেই আমাদের নিজেদেরকে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা কিম্বা শুধুমাত্র নিজেদের সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখার পরিবর্তে অন্যদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনা অত্যন্ত জরুরী। পারস্পরিক ভেদাভেদ বাধা দূর করে বোঝাপড়া বজায় রাখতে সামাজিক বিকাশ ও বিবর্তন এবং শান্তি ও সংহতির পরিবেশ তৈরী করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মানজনক পদ্ধতিতে আলাপ-আলোচনা অত্যন্ত জরুরী। আপনারা নিজেদের ব্যস্ততা সরিয়ে রেখে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, এরজন্য আমি আপনাদেরকে সমীহ করি। আপনাদের অধিকাংশই মুসলমান না হওয়া সত্ত্বেও আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন আর নিখাদ একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন যেখানে মসজিদের উদ্বোধন হচ্ছে। আপনাদের এই উচ্চমানের উদারতা, সহনশীলতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রশংসা করতেই হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ থেকে স্পষ্ট যে, একদিকে যেমন আমাদের জামাতের সঙ্গে আপনারা দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী। অপরদিকে একথাও প্রকাশ পায় যে আপনারা আমাদের ধর্ম সম্পর্কে ভালভাবে জানতে চান। এর থেকে বোঝা যায় যে, আপনারা এদিক সেদিকের কথা অন্ধের মত বিশ্বাস করতে চান না। আজকাল যেখানে গুজবের রমরমা চলছে, সেখানে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে আপনাদের জানার উৎসুকতা প্রশংসাযোগ্য। মিডিয়া ইসলাম সম্পর্কে যা কিছু বলে বা কিছু ইসলাম বিরোধী শক্তি যেভাবে পৃথিবীর সামনে ইসলামের চিত্র তুলে ধরে সেগুলি অবিকল সত্য বলে বিশ্বাস না করে আপনারা নিজে এখানে দেখতে এসেছেন যে ইসলামের প্রকৃত অর্থ কি আর ইসলাম কি শিক্ষা উপস্থাপন করে? এজন্য আমি আপনাদেরকে সাধুবাদ জানাই। সঙ্গে আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাও জ্ঞাপন করছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনারা জামাত আহমদীয়ার নীতি-বাক্য 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'- সম্পর্কে নিশ্চয় অবগত আছেন। এই স্লোগান কোন নতুন বিষয় নয়, আমাদের উদ্ভাবন করা নয়, বরং এই স্লোগানের ভিত্তি হল ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন করীমের শিক্ষা, এটি সেই শিক্ষা যা ইসলামের প্রবর্তক রসুল করীম (সা.) আমাদের প্রদান করেছেন। ইসলামের সূচনা থেকেই আমাদের এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান ও সহনশীলতা মানুষের মৌলিক মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্ত। যেমন কুরআন করীমের সূরা আনামের ১০৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মুসলমানেরা যেন ভিন্ন ধর্মের মানুষদের প্রতীমাগুলিকে দোষারোপ না করে, কেননা এর প্রতিক্রিয়ায় তারাও আল্লাহ তা'লাকে দোষারোপ করবে। কাজেই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে উস্কানি না দেওয়া থেকে বিরত রাখতে এবং সমাজকে ঘৃণা ও শত্রুতা থেকে রক্ষা করতে মুসলমানদেরকে স্মরণ করানো হয়েছে এবং এই শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে যে, তারা যেন সব সময় সহনশীলতা ও উদারতা প্রদর্শন করে। অতএব,এই যে প্রায়শ আপত্তি করা হয় যে, মুসলমানেরা অন্যান্য ধর্ম ও ধর্মীয় মনীষিদের সম্মান করে না- বাস্তবের সঙ্গের এর কোন সম্পর্ক নেই। বস্তুতঃ কুরআন করীমের শিক্ষার ভিত্তিতে

এরপর ৯ এর পাতায়..

জুমআর খুতবা

আঁ হযরত (সা.) বললেন, " তিনি (ইউনিস বিন মাত্তা) আমার ভাই ছিলেন। কেননা, তিনিও আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন আর আমিও আল্লাহ্‌র নবী।

বদরী সাহাবাদের (রা.) স্মৃতিচারণে কখনো কখনো এই মহিলাদের স্মৃতিচারণও হয়ে থাকে যেন তাদের উন্নত মর্যাদা সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি আর এজন্যই আমি বদরী সাহাবীদের (রা.) সাথে যে মহিলাদের উল্লেখ হয়েছে তাদের কথাও পাশাপাশি উল্লেখ করে থাকি।

নবী করীম (সা.)-এর মুক্তকৃত দাস, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) এবং তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে আয়মান (রা.) নিকাহর বিবরণ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১৪ই জুন , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (১৪ এহসান, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্‌হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:

গত খুতবায় আমি হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-এর বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করছিলাম, আর এ প্রেক্ষিতে তায়েফ সফরের ঘটনাও বর্ণিত হয়েছিল, যাতে তিনিও মহানবী (সা.)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন। তায়েফ সফরের আরো কিছুটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা যা সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন, সেটির আলোকে বর্ণনা করছি:

শে'বে আবি তালেব থেকে বের হওয়ার পর মহানবী (সা.) তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। যখন এই অবরোধ প্রত্যাহার হয় এবং মহানবী (সা.) নিজের চলাফেরার ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাধীনতা লাভ করেন তখন তিনি তায়েফে গিয়ে সেখানকার লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। তায়েফ বিখ্যাত একটি জায়গা যা মক্কা হতে ৪০ মাইল দক্ষিণপূর্ব দিকে অবস্থিত আর সে যুগে এখানে বনু সাকিফ গোত্র বসবাস করতো। কাবার বিশেষত্বকে বাদ দিলে, শহরের দৃষ্টিকোণ থেকে তায়েফ মক্কার সমপর্যায়ের শহর ছিল আর সেখানে অনেক প্রভাবশালী ও বিত্তবান লোকেরা বসবাস করত। আর তায়েফের এই গুরুত্বের কথা স্বয়ং মক্কাবাসীরাও স্বীকার করত, আর এটি মক্কাবাসীদেরই কথা যা আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ করেছেন যে,

لَوْ لَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ (সূরা আয যুখরুফ : ৩২)

অর্থাৎ এই কুরআন যদি খোদার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে তাহলে কেন এটি মক্কা অথবা তায়েফের সম্ভ্রান্ত কোন ব্যক্তির প্রতিঅবতীর্ণ হয় নি? মোটকথা নবুয়্যতের ১০ম বছরের শাওয়াল মাসে মহানবী (সা.) তায়েফে যান। কোন কোন বর্ণনা অনুসারে তিনি একা গিয়েছিলেন আবার কোন কোন বর্ণনা অনুসারে যায়েদ বিন হারেসা (রা.)ও সাথে ছিলেন। সেখানে তিনি (সা.) ১০ দিন অবস্থান করেন এবং শহরের অনেক নেতার সাথে একের পর এক সাক্ষাৎ করেন কিন্ত মক্কার মতো সেই শহরের ভাগ্যেও তখন ইসলাম গ্রহণ করা ধার্য ছিল না। তাই সবাই অস্বীকার করে, বরং ঠাট্টাবিদ্রূপ করে। অবশেষে মহানবী (সা.) তায়েফের সবচেয়ে বড় নেতা আব্দে ইয়ালীল বা হাদীস অনুসারে ইবনে আব্দে ইয়ালীলের কাছে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্ত সেও স্পষ্ট ভাষায় না করে দেয়, বরং উপহাসের ছলে বলে, আপনি যদি সত্য হয়ে থাকেন তাহলে আপনার সাথে কথা বলার ধৃষ্টতা আমার নেই আর যদি মিথ্যা হয়ে থাকেন তাহলে তো কথা বলার কোন প্রয়োজনই নেই, কোন উদ্দেশ্য নেই। এরপর কোথাও আবার শহরের যুবকদের ওপর মহানবী (সা.)-এর কথা প্রভাব বিস্তার না করে-এই আশঙ্কায় সে মহানবী (সা.) কে বলে, আপনার এখান থেকে চলে যাওয়াই উত্তম হবে। কেননা এখানকার কেউই আপনার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত নয়। আর এরপর সেই দুর্ভাগা ব্যক্তি শহরের ভবঘুরে ও বখাটে লোকদের তাঁর পিছনে লেলিয়ে দেয়। মহানবী (সা.) শহর থেকে বের হতেই এই লোকেরা চিৎকার চেচামেচি করতে করতে তাঁর পিছু ধাওয়া করে এবং তাঁকে পাথর মারতে থাকে। এতে তার পুরো শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। পূর্ববর্তী বর্ণনা অনুসারে হযরত যায়েদ বিন হারেসা সাথে ছিলেন। মহানবী (সা.) কে প্রস্তরাঘাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে তার মাথায়ও পাথর লাগে। যাহোক তারা লাগাতার তিন মাইল পর্যন্ত পাথর ছুড়তে ছুড়তে তাঁর পেছনে পেছনে আসতে থাকে ও গালমন্দ করতে থাকে। তায়েফ হতে ৩ মাইল দূরে মক্কার নেতা উতবা বিন রাবিয়ার একটি বাগান ছিল। মহানবী (সা.) তাতে এসে আশ্রয় নেন আর অত্যাচারী লোকেরা ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে চলে যায়। এখানে একটি ছায়াঘন স্থানে দাঁড়িয়ে তিনি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এভাবে দোয়া করেন-

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُوْ ضُعْفَ قُوَّتِيْ وَ قِلَّةَ حِيْلَتِيْ وَهَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ

اَللّٰهُمَّ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَاَنْتَ رَبِّيْ

অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আমি আমার শক্তির ঘাটতি ও উপায় হীনতা এবং মানুষের বিপরীতে আমার অসহায়ত্বের অনুযোগ তোমার সমীপেই করছি। হে আমার খোদা! সবচেয়ে বেশি দয়াময় এবং দুর্বলও অসহায়দের তুমিই একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষাকারী। তুমিই আমার প্রভু প্রতিপালক, আমি তোমারই চেহারার জ্যোতিতে আশ্রয় প্রার্থী কেননা কেবল তুমিই অন্ধকার দূর করে থাক এবং মানুষকে ইহজগত ও পরজগতের কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী বানিয়ে থাক।

উতবা ও শায়বা তখন তাদের এই বাগানে উপস্থিত ছিল। তারা যখন মহানবী (সা.) কে এ অবস্থায় দেখে তখন দূর সম্পর্কে আত্মীয় বা নিকটাত্মীয় হিসেবে হোক বা জাতিগত আত্মভিমানের কারণেই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক না কেন তারা আদ্দাস নামের তাদের একজন খ্রিষ্টান ক্রীতদাসের হাতে একটি পেয়ালায় কিছু আঙ্গুর দিয়ে তাঁর কাছে পাঠায়। মহানবী (সা.) তা গ্রহণ করেন আর আদ্দাসকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি কোথাকার অধিবাসী এবং কোন ধর্মের অনুসারী? সে বলে, আমি নেনোভার অধিবাসী এবং খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী। মহানবী (সা.) বলেন, এটি কি সেই নেনোভা যা খোদার পুণ্যবান বান্দা ইউনুস বিন মাত্তার নিবাস ছিল? তখন আদ্দাস বলে, হ্যাঁ। এরপর সে মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করে যে, ইউনুস (আ.) সম্পর্কে আপনি কীভাবে জানেন? মহানবী (সা.) বলেন, তিনি আমার ভাই ছিলেন, কেননা তিনিও আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন আর আমিও আল্লাহ্‌র নবী। এরপর তিনি (সা.) তাকে ইসলামের বাণী পৌঁছান, যা তার ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে আর সে আন্তরিকতার আতিশয্যে সামনে এগিয়ে মহানবী (সা.)-এর হাতে চুমু খায়। উতবা এবং শায়বাও দূরে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য অবলোকন করছিল। এরপর আদ্দাস যখন তাদের কাছে ফিরে যায় তখন তারা বলে, হে আদ্দাস! তোমার কী হয়েছিল যে, তুমি সে ব্যক্তির হাতে চুমু খাচ্ছিলে? এই ব্যক্তি তোমার ধর্ম নষ্ট করে দিবে যদিও তোমার ধর্ম তার ধর্মের চেয়ে উত্তম।

এরপর কিছুক্ষণ মহানবী (সা.) সেই বাগানে বিশ্রাম নেন। অতঃপর তিনি (সা.) সেখান থেকে যাত্রা করেন এবং নাখলায় পৌঁছেন যা মক্কা থেকে এক মনযিল বা ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। এরপর নাখলা থেকে যাত্রা করে তিনি (সা.) হেরা পর্বতে আসেন আর যেহেতু তায়েফ সফরের আপাত-ব্যর্থতার কারণে মক্কাবাসীদের ধৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল, তাই তিনি (সা.) সেখান থেকে মুত'এম বিন আদীকে সংবাদ

পাঠান যে, আমি মক্কায় প্রবেশ করতে চাই, এ কাজে তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারো? মুত'এম পাক্কা কাফের ছিল কিন্তু স্বভাবে ছিল ভদ্র । আর এমতাবস্থায় অর্থাৎ কেউ আশ্রয় চাইলে অস্বীকার করা বা আশ্রয় না দেওয়া আরবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। মোটকথা এটি আরবদের মাঝে সেই যুগেও অর্থাৎ অজ্ঞতার যুগেও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তাই সে তার সন্তানদের এবং আত্মীয়স্বজনদের সাথে নেয় এবং সকলে সশস্ত্র হয়ে কা'বার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় আর মুহাম্মদ (সা.)কে ডেকে পাঠায় যে, আসুন, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিচ্ছি। মহানবী (সা.) আসেন আর কা'বা প্রদক্ষিণ করেন আর সেখান থেকে মুত'এম এবং তার সন্তানদের সাথে তরবারির ছায়ায় নিজ ঘরে প্রবেশ করেন। পথিমধ্যে আবু জেহেল মুত'এমকে এই অবস্থায় দেখে বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি মুহাম্মদ'কে (সা.)-কে কেবল আশ্রয় দিয়েছ, না কি তার অনুসারী হয়ে গিয়েছ? মুত'এম বললো, আমি কেবল তার আশ্রয়দাতা, অনুসারী নই। তখন আবু জেহেল বলল, ঠিক আছে, তাহলে কোন সমস্যা নেই। যাইহোক মোটকথা মুত'এম অবিশ্বাসের মাঝেই মৃত্যুবরণ করে।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম. এ রচিত 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ১৮১-১৮৩)

তবে এটি অবশ্যই তার একটি পুণ্য ছিল। হযরত যায়েদ যখন হিজরত করে মদীনায় পৌঁছেন তখন তিনি হযরত কুলসুম বিন হিদামে'র কাছে অবস্থান করেন, তবে কারো কারে মতে তিনি হযরত সা'দ বিন খায়সামার কাছে অবস্থান করেন। হযরত উসায়েদ বিন হুযায়েরের সাথে মহানবী (সা.) তাকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করেন। কেউ কেউ লিখেছে যে, মহানবী (সা.) হযরত হামযা'র সাথে তার ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। অর্থাৎ হযরত হামযা'কে তার ভাই বানিয়ে দেন। এ কারণেই উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত হামযা যুদ্ধের সময় হযরত যায়েদের পক্ষে ওসিয়্যত করেছিলেন।

(আত তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত)

এ বিষয়ে হযরত মীর্যা বশির আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে আরো লিখেন, মদীনা পৌঁছানোর কিছুদিন পর মহানবী (সা.) যায়েদ বিন হারেসাকে কিছু টাকা দিয়ে মক্কায় প্রেরণ করেন, যিনি কয়েকদিনেরমধ্যে তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে সাথে নিয়ে নিরাপদে মদীনা পৌঁছে যান। তার সাথে আব্দুল্লাহ্ বিন আবি বকর ও হযরত আবু বকরের পরিবার পরিজন'কেও নিয়ে মদীনা পৌঁছে যান।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম. এ রচিত 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ২৬৯)

হযরত বারা'আ (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন মহানবী (সা.) যুল কা'দায় ওমরাহ করতে মনস্থ করলেন তখন মক্কার অধিবাসীরা মহানবী (সা.) কে মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে তিনি (সা.) তাদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করেন যে, তিনি (সা.) পরবর্তী বছর ওমরাহ্'র উদ্দেশ্যে আসবেন এবং মক্কায় তিন দিন অবস্থান করবেন। যখন চুক্তিনামা লেখা হচ্ছিল তা এভাবে লেখা হয় যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) সন্ধি করেছেন। মক্কাবাসীরা বলে যে, আমরা এই বিষয়টি মানি না। আমরা যদি আপনাকে আল্লাহ্র রসূলই মনে করতাম তাহলে আপনাকে কখনো বাধা দিতাম না। তারা বলে, আমাদের কাছে তো আপনি (শুধু) মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্। তিনি (সা.) বলেন, আমি আল্লাহ্র রসূল ও আর মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ও । তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, এখান থেকে রসূলুল্লাহ্ শব্দটি মুছে দাও। হযরত আলী (রা.) বলেন, কখনো না, আল্লাহ্র কসম, আমি আপনার উপাধি কখনো মুছব না,অর্থাৎ আল্লাহ্তা'লা আপনাকে যে "আল্লাহ্র রসূল" উপাধি দিয়েছেন -তা আমি মুছতে পারবো না। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার কাছ থেকে সেই লিখিত নিয়ে নেন। মহানবী (সা.) ভালো করে লিখতে না জানলেও তিনি (সা.) এভাবে লিখেন, এগুলো হলো সেই শর্ত যা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ নির্ধারণ করেছেন। মক্কায় কেউ অস্ত্র নিয়ে আসবে না, কেবল খাপে রাখা তরবারি ছাড়া। আর মক্কাবাসীদের কাউকে সাথে নিয়ে যাবে না, তারা তাদের সাথে যেতে চাইলেও, আর নিজ সাথীদের কাউকে বাধা দিবে না, যদি সে মক্কায় থেকে যেতে চায়। মোটকথা এই চুক্তি অনুযায়ী মহানবী (সা.) পরবর্তী বছর মক্কায় প্রবেশ করেন এবং তিন দিনের সময় সমাপ্ত হয়ে যায়। তখন কুরাইশরা হযরত আলীর কাছে আসে এবং বলে, আপনি নিজের সাথি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-কে বলুন, তিনি যেন এখান থেকে চলে যান; কেননা নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেছে। তিন দিন অবস্থানের শর্ত ছিল যা শেষ হয়ে গেছে। অতএব মহানবী (সা.) সেখান থেকে রওনা হয়ে যান। হযরত হামযার কন্যা উমারা, এক বর্ণনায় তার নাম আ'মামাহ বর্ণিত হয়েছে এবং অন্য বর্ণনায় আমাতুল্লাহ্ও দেখা যায়, তাঁর অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর পেছনে পেছনে আসেন এবং বলতে থাকেন হে চাচা, হে চাচা! হযরত আলী (রা.) গিয়ে তার হাত ধরেন এবং হযরত ফাতেমা (আ.) কে বলেন, আপনি চাচার মেয়েকে নিয়ে যান।তিনি তাকে বাহনে চড়িয়ে নেন। তখন হযরত আলী, হযরত যায়েদ আর হযরত জা'ফর হযরত হামযার মেয়েকে নিয়ে বিতণ্ডা আরম্ভ করেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমিই তাকে নিয়েছি কেননা সে আমার চাচাতো বোন, আর হযরত জা'ফর বলেন, আমার চাচার মেয়ে আর তার খালা আসমা বিনতে উমায়েস আমার স্ত্রী আর হযরত যায়েদ বলেন, মহানবী (সা.) কর্তৃক রচিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের কারণে সে আমার ভাইয়ের মেয়ে। তখন মহানবী (সা.) এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, সে তার খালার কাছেই থাকবে,অর্থাৎ হযরত জা'ফর এর কাছেই থাকবে। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, খালা হলো মায়ের স্থলাভিষিক্ত। আর হযরত আলীকে বলেন, তুমি আমার আর আমি তোমার আর হযরত জা'ফরকে বলেন, তুমি চেহারাও বৈশিষ্ট্যে আমার সাথে সামঞ্জস্য রাখ আর হযরত যায়েদ'কে বলেন, তুমি আমাদের ভাই এবং বন্ধু। হযরত আলী বলেন, আপনি কি হযরত হামযার মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন কি? তিনি (সা.) বলেন, সে আমার দুধ ভাইয়ের মেয়ে আর আমি এই মেয়ের চাচা। এই বর্ণনা বুখারীতেও আছে আর সীরাতুল হালাবিয়াতেও রয়েছে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস-৪২৫১) (আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ:৯৫)

হযরত যায়েদ বিন হারেসা হযরত উম্মে আয়মানকে বিয়ে করেছিলেন। হযরত উম্মে আয়মানের নাম ছিল বারাকাহ আর তিনি তার পুত্র আয়মানের কারণে উম্মে আয়মান ডাক নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়ার অধিবাসী ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ্র ক্রীতদাসী ছিলেন আর তার মৃত্যুর পর তিনি হযরত আমেনার কাছেই ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর বয়স যখন ছয় বছর ছিল তখন তাঁর(সা.) সম্মানিত জননীতাঁকে সাথে নিয়ে দেখাসাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মদিনায় নিজ বাপের বাড়ি যান। সেসময় হযরত উম্মে আয়মান সেবিকা হিসাবে সাথে ছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি বয়সে ছোটও ছিলেন। মদিনা থেকে ফেরার পথে যখন তারা আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছেন, যা মসজিদে নববী থেকে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত, তখন হযরত আমেনা ইন্তেকাল করেন। হযরত উম্মে আয়মান মহানবী (সা.)-কে সেই দু'টি উটে চড়িয়েই মক্কায় ফিরিয়ে আনেন যে দু'টি উটে চড়ে তারা গিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতের দাবির পূর্বে মক্কায় হযরত উম্মে আয়মানের বিয়ে উবায়েদ বিন যায়েদের সাথে হয়, যিনি নিজেও একজন হাবশী ক্রীতদাস ছিলেন। তাদের ঘরে পুত্রসন্তানজন্মগ্রহণ করে যার নাম ছিল আয়মান। হযরত আয়মান হুনায়েনের যুদ্ধে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন। হযরত উম্মে আয়মানের স্বামীর মৃত্যু হলে তার বিয়ে হযরত যায়েদের সাথে করিয়ে দেওয়া হয়। একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত উম্মে আয়মান মহানবী (সা.)-এর সাথে অত্যন্ত স্নেহের আচরণ করতেন এবং তাঁর যত্ন নিতেন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতবাসীনিকে বিয়ে করে সুখী হতে চায় সে যেন উম্মে আয়মানকে বিয়ে করে নেয়। অতঃপর একথা শুনে হযরত যায়েদ বিন হারেসা তাকে বিয়ে করেন এবং তাদের ঘরে হযরত উসামার জন্ম হয়। হযরত উম্মে আয়মান মুসলমানদের সাথে হিজরত করে আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া গিয়েছিলেন। হিজরতের পর সেখান থেকে মদিনা ফিরে আসেন এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের সময় তিনি মানুষকে পানি পান করাতেন এবং আহতদের সেবা শুশ্রূষা করতেন। তিনি খায়বারের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেন। ২৩ হিজরী সনে যখন হযরত উমর (রা.) শাহাদত বরণ করেন তখন তিনি অনেক কেঁদেছিলেন। মানুষ জিজ্ঞেস করে যে, তুমি কেন কাঁদছ? তখন তিনি উত্তরে বলেন, হযরত উমরের শাহাদতের কারণে ইসলাম দুর্বল হয়ে গেছে। হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালের প্রারম্ভে হযরত উম্মে

রসুলের বাণী

নিজের হাতে উপার্জিত জীবিকার চেয়ে উত্তম জীবিকা দ্বিতীয়টি নেই।

(সহী বুখারী, কিতাবুল বুয়ু)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

আয়মানের ইন্তেকাল হয়।

(আত তাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত) (উসদুল গাবা, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৯১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত) (মুজামুল বালদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ১০২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত)

হযরত উম্মে আয়মানের সাথে হযরত যায়েদ (রা.)-এর বিয়ে সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনার বরাতে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব যা লিখেছেন তার সারমর্ম হলো, উম্মে আয়মান হলেন সেই নারী যাকে মহানবী (সা.) তার পিতার মৃত্যুর পর এক কৃতদাসী হিসাবে উত্তরাধিকার স্বরূপ লাভ করেছিলেন। বড় হয়ে তিনি (সা.) তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং তার সাথে অনেক সদয় ব্যবহার করতেন। পরবর্তীতে উম্মে আয়মানের বিয়ে তাঁর (সা.) মুক্ত ক্রীতদাস যায়েদ বিন হারেসার সাথে হয়ে যায় আর এরপর তার গর্ভে উসামা বিন যায়েদ জন্মগ্রহণ করেন। (হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম. এ রচিত 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ:৯৯) যাকে আলহিব্বু ইবনুল হিব্ব অর্থাৎ প্রেমাস্পদের প্রিয় পুত্র বলা হতো।

(আল ইসতিয়াব ফি মারেফাতুল আসহাব, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭৫)

রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত উম্মে আয়মানকে দেখে বলতেন, 'ইয়া উম্মা' অর্থাৎ হে আমার মা!তিনি (সা.) হযরত উম্মে আয়মানের দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'হাযিহী বাক্বিয়্যাতু আহলে বাইতি' অর্থাৎ ইনি হলেন আমার আহলে বায়তের স্মৃতিচিহ্ন। অপর এক বর্ণনানুযায়ী মহানবী (সা.) এটিও বলতেন যে, 'উম্মা আয়মানা উম্মী বা'দা উম্মী' অর্থাৎ আমার আসল মায়ের পর উম্মে আয়মানই আমার মা এবং তিনি (সা.) তার সাথে সাক্ষাতের জন্য তার বাড়িতেও যেতেন।

(তারিখুত তাবারী, খণ্ড-১৩, পৃ: ৩৭৫, কিতাবুল মুযীল, দারুল ফিকর বেরুত, ২০০২) (উসদুল গাবা, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৯১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত)

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, মুহাজেররা যখন মক্কা থেকে মদিনায় আসেন এবং তাদের হাতে কিছুই ছিল না অথচ আনসাররা জয়গা-জমি ও সম্পদের মালিক ছিলেন; তখন আনসাররা তাদের সাথে চুক্তি করেন যে, তারা প্রত্যেক বছর মুহাজেরদেরকে নিজেদের বাগানের ফল দিবে কিন্তু বাগানে কাজকর্ম তারা নিজেরাই করবেন। বাগানের ফল বা উপার্জন তাদেরকে দিবেন কিন্তু বাগানে পরিশ্রম ও শ্রমিকের কাজ, এর পরিচর্যার কাজ তারা নিজেরাই করবেন, মুহাজেরদের করতে দিবেন না। হযরত আনাস (রা.)-এর মা ছিলেন হযরত উম্মে সুলায়েম যিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবী তালহারও মা ছিলেন। সুতরাং হযরত আনাসের মা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে কিছু খেজুরের গাছ দিয়ে রেখেছিলেন। মহানবী (সা.) এই গাছগুলো তাঁর দাইমা হযরত উম্মে আয়মানকে দিয়ে দেন যিনি হযরত উসামা বিন যায়েদের মা ছিলেন। ইবনে শিহাব বলতেন, আমাকে হযরত আনাস বিন মালেক বলেছেন যে, মহানবী (সা.) যখন খায়বারের যুদ্ধ শেষে মদিনা ফিরে যান তখন মুহাজেররা আনসারদের সেই দান ফিরিয়ে দেন অর্থাৎ সেসব ফলবান বৃক্ষ যা তারা নিজেদের বাগান থেকে তাদেরকে দিয়েছিল, তা তারা ফিরিয়ে দেন। তখন তাদের হাতেও কিছুটা অর্থ-সম্পদ এসেছিল। মহানবী (সা.)-ও হযরত আনাসের মাকে তাদের খেজুর গাছ ফেরত দিয়ে দেন আর তার জায়গায় রসূলুল্লাহ্ (সা.)উম্মে আয়মানকে নিজের বাগান থেকে কিছু গাছ দান করেন।

(সহী আল বুখারী, কিতাবুল হিবা, হাদীস: ২৬৩০)

বুখারীর অপর এক হাদীসেএর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে এসেছে, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, কোন কোন সাহাবী বিশেষভাবে কিছু খেজুর গাছ মহানবী (সা.)-এর জন্যনির্ধারণ করে দিতেন। তিনি (সা.) যখন কুরায়যা এবং নাযীর জয় করলেন তখন তাঁর আর এসবের প্রয়োজন রইলো না। তিনি (রা.) বলেন, আমার পরিবারের সদস্যরা আমাকে মহানবী (সা.) এর কাছে গিয়ে তাঁকে বলতে বলে যে, যেসব গাছ তারা মহানবী (সা.)-কে দিয়েছিল সেগুলো বা তা থেকে কিছু গাছ তিনি যেন ফেরত দেন। কেননা, এখন আর তাঁর এসবের প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, যেহেতু এগাছগুলো মহানবী (সা.) হযরত উম্মে আয়মানকে দিয়ে রেখেছিলেন, একথা শুনে হযরত উম্মে আয়মান আসেন এবং আমার কাঁধে কাপড় পেঁচিয়ে বলেন, আমি এগুলো কখনো দিবো না। সেই সত্তার কসম যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, এগাছগুলো তুমি আদৌ পাবে না কেননা মহানবী (সা.) এগুলো আমাকে দিয়ে দিয়েছেন বা এমনই কোন কথা বলে থাকবেন। মহানবী (সা.) হযরত উম্মে আয়মানকে বলেন, কোন সমস্যা নেই, তুমি এগুলো ফেরত দিয়ে দাও, তোমাকে যতগুলো গাছ দেয়া হয়েছে আমি তোমাকে অন্য জায়গা থেকে ততগুলো গাছই দিব। কিন্তু তিনি বলতেন, আল্লাহ্‌র কসম! কখনো নয়। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমার ধারণা হলো অবশেষে তিনি (সা.) হযরত আয়মানকে তার চেয়ে দশগুণ বেশি দিয়েছেন বা এমনই কোন কথা বলে থাকবেন যে, আমি তোমাকে দশগুণ বেশি দিব। (সহী আল বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস: ৪১২০ এরপর এ গাছগুলো ফেরত দেওয়া হয়।

একটি বর্ণনা রয়েছে যে, পায়ে হেঁটে মদিনায় হিজরত করার সময় হযরত উম্মে আয়মানের খুবই তৃষ্ণা পায়, অত্যন্ত পুণ্যবতী নারী ছিলেন এবং অতি বয়োবৃদ্ধা ছিলেন, আল্লাহর সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তখন তার কাছে পানিও ছিল না আর প্রচণ্ড গরম ছিল। তিনি তার মাথার ওপর কোন কিছুর আওয়াজ শুনতে পান আর দেখতে পান যে, আকাশ থেকে বালতির ন্যায় একটি বস্তু তার সামনে ঝুলছিল যা থেকে পানির স্বচ্ছ বিন্দু ঝরে পড়ছিল। তিনি তা থেকে তৃপ্তিসহ পানি পান করেন। তিনি বলতেন, এরপর থেকে আমার কখনো পিপাসা বা তৃষ্ণার কষ্ট হয় নি । কখনো রোজা থাকা অবস্থায়ও তৃষ্ণা পেলে আমি পিপাসার্ত থাকতাম না।

বদরী সাহাবাদের (রা.) স্মৃতিচারণে কখনো কখনো এই মহিলাদের স্মৃতিচারণও হয়ে থাকে যেন তাদের উন্নত মর্যাদা সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি আর এজন্যই আমি বদরী সাহাবীদের (রা.) সাথে যে মহিলাদের উল্লেখ হয়েছে তাদের কথাও পাশাপাশি উল্লেখ করে থাকি।

হযরত উম্মে আয়মানের জিহ্বায় কিছুটা জড়তা ছিল। তিনি যখন কারো কাছে যেতেন, তখন 'সালামুল্লাহে আলাইকুম' বলার পরিবর্তে জড়তার কারণে 'সালামুল্লাহ্ আলায়কুম' বলতেন। (পূর্বে 'সালামুল্লাহে আলাইকুম' বলারই রীতি ছিল।) অতএব মহানবী (সা.) তাকে 'সালামুল্লাহে আলায়কুম' এর পরিবর্তে 'সালামুন আলাইকুম' অথবা 'আসসালামু আলাইকুম' বলার অনুমতি দেন আর এখন সেই রীতিই প্রচলিত আছে।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন মহানবী (সা.) পানি পান করছিলেন। সে সময় হযরত উম্মে আয়মান (রা.) তাঁর কাছে ছিলেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকেও পানি পান করান। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এতে আমি তাকে বললাম, তুমি মহানবী (সা.)-কে এভাবে পানি পান করাতে বলছ? এতে তিনি বলেন, আমি কি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অধিক সেবা করি নি? তখন মহানবী (সা.) বলেন, তুমি সঠিক বলেছ। এরপর তিনি (সা.) তাকে পানি পান করান।

(আসসীরাতুল হুলবিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭৭-৭৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন হযরত উম্মে আয়মান (রা.) কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, মহানবী (সা.) এর জন্য আপনি কেন কান্না করছেন। তিনি বলেন, আমি জানতাম, নবী করীম (সা.)অবশ্যই মৃত্যু বরণ করবেন। কিন্তু আমি এ কারণে কাঁদছি যে, ওহী আমাদের প্রতি ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেছে।

(উসদুল গাবা, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৯১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ২০০৮)

অর্থাৎ মহানবী (সা.)এর বিয়োগব্যথা তো আছেই কিন্তু একইসাথে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যে নতুন নতুন বাণী আমরা পেতাম অর্থাৎ ওহী হতো, সেই ধারা এখন বন্ধ হয়ে গেছে; এই কারণে আমি কাঁদছি।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর একবার হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, আমাদের সাথে হযরত উম্মে আয়মান (রা.)-এর কাছে চল তার সাথে সাক্ষাৎ করবো, যেমটি কি-নামহানবী (সা.) তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আমরা যখন তার কাছে পৌঁছলাম, তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। এতে আমরা উভয়েই তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি কেন কাঁদছেন? আল্লাহ্ তা'লার কাছে যা কিছু রয়েছে, তা তাঁর রসূলের জন্য উত্তম। হযরত উম্মে আয়মান (রা.) বলেন, আমি এ কারণে কাঁদছিনা যে, আল্লাহ্‌র কাছে মহানবী (সা.) এর জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে বলে আমি অবগত নই। আমি যেমনটি উল্লেখ করেছি, পুণ্যের ক্ষেত্রে তাঁরও অনেক বড় পদমর্যাদা ছিল। তিনি বলেন, আমি তো এজন্য কাঁদছি যে, এখন আকাশ থেকে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি তাদের দু'জনকেও কাঁদিয়ে দিলেন আর তারা দু'জনও কাঁদতে আরম্ভ করেন।

(সহী মুসলিম, কিতাব ফাযায়েলুস সাহাবা, হাদীস: ২৪৫৪)

হযরত উসামা (রা.) এবং হযরত যায়েদ (রা.)-এর মাঝে গাত্রবর্ণের বেশ পার্থক্য ছিল। মা যেহেতু ইথিওপিয়ার অধিবাসীনি ছিলেন, আফ্রিকান ছিল

আর উসামা ছিলেন ভিন্ন স্থানের অধিবাসী, এ কারণে পিতা-পুত্রের মাঝে পার্থক্য ছিল। তার গায়ের বর্ণ মায়ের রং ঘেষা ছিল, যার কারণে কেউ কেউ হযরত উসামার বংশ নিয়ে আপত্তি করতো আর বলতো যে, তিনিহযরত যায়েদ (রা.) এর পুত্র নন বা আপত্তির খাতিরেই আপত্তি উত্থাপিত হতো আর মুনাফেকরাও আপত্তি করতো। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) একদিন আমার কাছে আসেন আর তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন। তিনি বলেন, হে আয়েশা! এখনই মুজাজ্জেজ মুদলাজি আমার কাছে এসেছিল। সে উসামা বিন যায়েদ এবং যায়েদ বিন হারেসাকে এই অবস্থায় দেখেছে যখন তাদের ওপর একটি চাদর ছিল। গরমের কারণে বা বৃষ্টির কারণেঅথবা অন্য কোন কারণে তারা একটি চাঁদর জড়িয়ে রেখেছিলেন এবং মুখ ঢেকে রেখেছিলেন যদ্বারা তারা নিজেদের মস্তক আবৃত করে রেখেছিলেন আর চেহারাও দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু তাদের উভয়ের পা ছিল অনাবৃত, শুধুমাত্র পা (চাদরের) বাইরে ছিল। তখন সে বলে, নিশ্চিতরূপে এই পাগুলো পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ উভয়ের পায়ের মধ্যেই যথেষ্ট মিল রয়েছে। এতে মহানবী (সা.) খুবই আনন্দিত ছিলেন অর্থাৎ উসামার প্রতি যেসব আপত্তি করা হতো আজ সেসব আপত্তির অবসান ঘটেছে। এক জগৎপূজারী ব্যক্তি এবং দেহাবয়ব বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরও সাক্ষ্য রয়েছে ।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ফারায়েয, হাদীস-৬৭৭১) (ফাতহুল বারী শারাহ সহী আল বুখারী, কিতাবুল ফারায়েয, হাদীস-৬৭৭১)

এ ব্যক্তি এক দক্ষ দেহাবয়ব বিশেষজ্ঞ আর আরব সমাজে এটি একটি চূড়ান্ত রায় বলে গণ্য হতো। এমনিতে অবশ্য কিছুই আসে যায় না কিন্তু জগৎপূজারীদের মুখ বন্ধ করার জন্য, মুনাফিকদের বন্ধ করার জন্য এটি একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে যার ফলে মহানবী (সা.) খুবই আনন্দিত ছিলেন।

হযরত যায়েদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর মুক্ত কৃতদাস এবং পালকপুত্রও ছিলেন। তিনি (সা.) হযরত যায়েদ (রা.)-কে হযরত যয়নব বিনতে জাহ্শ-এর সাথে বিয়ে করিয়েছিলেন। কিন্তু এই বিয়ে বেশি দিন স্থায়ী হয় নি এবং হযরত যায়েদ (রা.) হযরত যয়নব (রা.)-কে তালাক দেন। এই বিয়ে এক বছর বা এর চেয়ে কিছু বেশি সময় টিকেছিল। এরপর মহানবী (সা.) স্বয়ং হযরত যয়নব বিনতে জাহ্শ (রা.)-কে বিয়ে করেছিলেন।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত, দারুল মারেফা, বেরুত, ২০০৭)

বিভিন্ন সূত্র ও বরাতেহযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহের (রা.) সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে যা লিপিবদ্ধ করেছেন এর বিস্তারিত বিবরণ কিছুটা এরূপ:

হিজরতের ৫ম বছরে বনু মুস্তালিক-এর যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে,যা ৫ম হিজরীর শাবান মাসে ঘটেছিল, মহানবী (সা.) হযরত যয়নব বিনতে জাহ্শ (রা.)-কে বিয়ে করেন। হযরত যয়নব (রা.) মহানবী (সা.) ফুপু উমায়মা বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা ছিলেন। আর খুবই পুণ্যবতী ও খোদাভীরু হওয়া সত্ত্বেও তার স্বভাবে কিছুটা হলেও পারিবারিক বড়াই এর ভাব পরিলক্ষিত হতো। এর বিপরীতে মহানবী (সা.)-এর স্বভাব এরূপ ধ্যানধারণা থেকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র ছিল। যদিও তিনি পারিবারিক অবস্থানকে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনার যোগ্য জ্ঞান করতেন কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে সম্মানের বা শ্রেষ্ঠত্বের সত্যিকার মানদণ্ডের ভিত্তি ছিল ব্যক্তিগত গুণ, ব্যক্তিগত খোদাভীতি ও পবিত্রতার ওপর। যেমনটি পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, **'ইন্না আকারামাকুম ইন্দাল্লাহি আতকাকুম'** (সূরা আল্ হুজুরাত: ১৪) অর্থাৎ লোকসকল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাধিক মুত্তাকী বাখোদাভীরু সেই সবচেয়ে বড় ও সম্মানিত। অতএব তিনি নির্দ্বিধায় নিজের মুক্ত কৃতদাস হযরত যায়েদ বিন হারেসার সাথে তাঁর এই আত্মীয়া অর্থাৎ যয়নব বিনতে জাহ্শ (রা.)'র বিয়ের প্রস্তাব দেন। প্রথমে যয়নব (রা.) নিজের পারিবারিক আভিজাত্যের বা বংশ গৌরবের কথা চিন্তা করে এটি (অর্থাৎ প্রস্তাব) অপছন্দ করেন। কিন্তু অবশেষে মহানবী (সা.)-এর গভীর আকাঙ্ক্ষা দেখে সম্মত হন। যাহোক, মহানবী (সা.)-এর আকাঙ্ক্ষা এবং প্রস্তাব অনুসারে যয়নব এবং যায়েদের বিয়ে হয়ে যায়। যয়নব (রা.) যদিও এই সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার জন্য ভদ্রতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন কিন্তু যায়েদ (রা.) নিজের মতো করেধরে নেন যে, হযরত যয়নব (রা.)'র হৃদয়ে এখনও এই সংশয় বিদ্যমান রয়েছে যে, আমি একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে এবং মহানবী (সা.)-এর নিকটাত্মীয়, আর হযরত যায়েদ (রা.) একজন মুক্তকৃতদাস মাত্র এবং আমার সমপর্যায়ের নন। অপরদিকে স্বয়ং হযরত যায়েদ (রা.)'র হৃদয়েও হযরত যয়নব (রা.)'র বিপরীতে নিজের অবস্থান নিচু বা ছোট হওয়ার হীনমন্যতা ছিল আর এই অনুভব ধীরে ধীরে আরো বদ্ধমূল হয়ে তাদের পারিবারিক জীবনকে নিরানন্দ করে তুলেছিল আর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তিক্ততা লেগেই থাকতো। আর এই অসহনীয় অবস্থা যখন অনেক বেশি বেড়ে যায় তখন যায়েদ বিন হারেসা (রা.)মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন আর নিজের ধারণা অনুযায়ী যয়নবের ব্যবহারের বিষয়ে অভিযোগ করে তাকে তালাক দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। আরেকটি রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এই অভিযোগও করেন যে, যয়নব কর্কশ ভাষা ব্যবহার করেন তাই আমি তাকে তালাক দিতে চাই। এই অবস্থা জেনে মহানবী (সা.)-এর স্বভাবতই কষ্টও হয় কিন্তু তিনি যায়েদ (রা.)-কে তালাক দিতে বারণকরেন। আর সম্ভবত একথা অনুভব করে যে, যায়েদের পক্ষ থেকে সংসার-ধর্ম পালনের চেষ্টায় ঘাটতি রয়েছে, তিনি (সা.) হযরত যায়েদ (রা.)-কে উপদেশ দেন যে, আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং খোদাভীতির সাথে যেভাবে পারো সংসার টিকিয়ে রাখার চেষ্টা কর। অতএব পবিত্র কুরআনেও তাঁর এই বাক্যগুলো বর্ণিত হয়েছে যে, اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ (সূরা আল্ আহযাব: ৩৮) অর্থাৎ হে যায়েদ! নিজের স্ত্রীকে তালাক দিও না এবং খোদার তাকওয়া অবলম্বন কর। তাঁর এই উপদেশের কারণ এটিই ছিল যে, প্রধানত নীতিগতভাবে মহানবী (সা.) তালাক'কে অপছন্দ করতেন। কাজেই, একবার তিনি বলেছিলেন, "আবগাযুল হালালে ইলাল্লাহেত্ তালাক"। অর্থাৎ সকল বৈধ জিনিসের মাঝে খোদার সবচেয়ে অপছন্দ হচ্ছেতালাক। এ কারণেই ইসলামে শুধুমাত্র চূড়ান্ত চিকিৎসা হিসেবে এর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত যেমনটি ইমাম হোসেন (রা.)'র পুত্র ইমাম যয়নুল আবেদীন আলী বিন হোসেন এর একটি রেওয়ায়েত রয়েছে আর ইমাম যাহরী এই রেওয়ায়েতকে নীর্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। মহানবী (সা.)-এর কাছে যেহেতু পূর্বেই খোদার এই ঐশী ওহী হয়েছিল যে, অবশেষে যায়েদ বিন হারেসা যয়নব (রা.)-কে তালাক দিয়ে দিবেন আর এরপর যয়নবের সাথে তাঁর (সা.) বিয়ে হবে, একারণে নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে বলে জ্ঞান করে তিনি (সা.) এ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে দূরত্ব বজায় রেখে নিরপেক্ষ থাকতে চাইতেন আর নিজের পক্ষ থেকে পুরোপুরি চেষ্টা করছিলেন যাতে যায়েদ এবং যয়নবের বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে তাঁর (সা.) কোন ভূমিকা যেন আদৌনা থাকে। আর যতদিন পর্যন্ত সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় ততদিন যেন তারা মানিয়ে চলে এবং সম্পর্ক বহাল থাক। এই ইচ্ছার কারণেই তিনি (সা.) অত্যন্ত জোরালোভাবে যায়েদ (রা.)-কে এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তুমি তালাক দিও না আর খোদাভীতি অবলম্বন করে যেভাবে সম্ভব সংসার কর। মহানবী (সা.)-এর এই আশঙ্কাও ছিল যে, যায়েদের সাথে তালাকের পর যয়নবের সাথে যদি তাঁর বিয়ে হয় তাহলে এ কারণে মানুষ আপত্তি করবে যে, তিনি (সা.) তাঁর পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তাকে বিয়ে করেছেন আর অযথাই পরীক্ষার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। যেমন, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন বলেন, وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاهُ (সূরা আহযাব: ৩৮) অর্থাৎ হে নবী! তুমি তোমার হৃদয়ে সেই কথা গোপন রেখেছিলে যা অবশেষে খোদা তা'লা প্রকাশ করে দিয়েছেন। আর তুমি মানুষকে ভয় করতে, অথচ নিশ্চয় খোদা তা'লা অনেক বেশি অধিকার রাখেন যেন তাঁকে ভয় করা হয়।

যাহোক মহানবী (সা.) যায়েদকে আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বনের নসীহত করে তালাক দিতে বারণ করেন আর যায়েদ তাঁর (সা.) এই নসীহতের আনুগত্য করে নিশ্চুপ হয়ে ফিরে যান। কিন্তু যাদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তাদের মিলিত হওয়া কঠিন, এক ফাটল সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল,খুবই কঠিন কাজ ছিল। যা জোড়া লাগার ছিল না তা আর জোড়া লাগে নি।কিছুদিন পর যায়েদ স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেন। যয়নবের ইদ্দতকাল শেষ হয়ে গেলে তার বিয়ের ব্যাপারে মহানবী (সা.) এর ওপর পুনরায় ওহী অবতীর্ণ হয় যে, মহানবী (সা.) এর স্বয়ং তাকে বিয়ে করে নেয়া উচিত। আর এই ঐশী নির্দেশে এই প্রজ্ঞার পাশাপাশি, অর্থাৎ এতে হযরত যয়নবের মনস্তুষ্টি হবে এবং তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকেবিয়ে করা মুসলমানদের মাঝে দোষের কিছু মনে করা হবে না, এই প্রজ্ঞাও অন্তর্নিহিত ছিল যে, হযরত যায়েদ যেহেতু মহানবী

যুগ ইমামের বাণী

যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এক সত্তায় পরিণত হও, ততক্ষন বলা যেতে পারে না যে তোমরা আত্মশুদ্ধি করেছ।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Anowar Ali, Jamat Ahmadiyya Abhaipuri (Assam)

(সা.) এর পালকপুত্র ছিলেন এবং তাঁর (সা.) পুত্র অভিহিত হতেন তাই তিনি (সা.) স্বয়ং যখন তার (অর্থাৎ যায়েদের) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করবেন তখন মুসলমানদের ওপর কার্যত এর একটি প্রভাব পড় বে যে, কাউকে পুত্র বললেই সে প্রকৃত পুত্র হয়ে যায় না আর প্রকৃত পুত্রের মতো বিধিনিষেধ তার ওপর আরোপিত হয় না। একইসাথে আরবের এই অজ্ঞতাপ্রসূত প্রথা মুসলমানদের মাঝ থেকে পুরোপুরি উঠে যাবে। অতএব ইসলামী ইতিহাসের সবচেয়ে সঠিক রেকর্ড পবিত্র কুরআনে এই বিষয়ে বলা হয়েছে-

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْ أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُوْلًا

(সূরা আহযাব: ৩৮)

অর্থাৎ যখন যায়েদ যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয় তখন আমরা তোমার সাথে যয়নবের বিয়ে দেই যেন মু'মিনদের জন্য নিজেদের পালকপুত্রদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের, যখন তারা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়, বিয়ে করার ক্ষেত্রে কোন বাধা না থাকে; আর খোদার এই নির্দেশ এভাবেই পূর্ণ হওয়ার ছিল।

মোটকথা এই ঐশী ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর, যাতে মহানবী (সা.)-এর নিজের বাসনা এবং ইচ্ছার কোন হাত ছিল না, তিনি (সা.) যয়নবের সাথে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন এবং হযরত যায়েদের মাধ্যমেই হযরত যয়নবকে বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করেন। আর হযরত যয়নবের পক্ষ থেকে সম্মতি জানানোর পর তার ভাই আবু আহমদ বিন জাহাশ তার পক্ষ থেকে ওলী হয়ে চারশত দিরহাম দেনমোহরে মহানবী (সা.) এর সাথে তার বিয়ে দেন। আর এভাবে সেই প্রাচীন প্রথাকে, যা আরব ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, মহানবী (সা.) এর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ইসলামে মূল থেকে উৎপাটন করা হয়েছে।

এখানে এটিও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সাধারণ ইতিহাসবিদ এবং মুহাদ্দেসদের ধারণা হলো, যয়নবের বিয়ে সম্পর্কে যেহেতু ঐশী ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল আর খোদা তা'লার বিশেষ ইচ্ছায় এই বিয়ে সংঘটিত হয়েছে তাই তাদের বিয়ের বাহ্যিক রীতি পালন করা হয় নি, কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয়। নিঃসন্দেহে খোদার নির্দেশে এই বিয়ে হয়েছে আর বলা যেতে পারে যে, আকাশে এই বিয়ে পড়ানো হয়েছে কিন্তু এর কারনে শরীয়তের বাহ্যিক যে আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে -তা থেকে অব্যাহতি লাভ হওয়া সম্ভব হতে পারে না কেননা তা-ও খোদা তা'লা কর্তৃকই নির্ধারিত। অতএব ইবনে হিশাম এর রেওয়ায়েত, যার উদ্ধৃতি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাতে বিয়ের বাহ্যিক অনুষ্ঠান সম্পাদিত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই বিষয়ে সুস্পষ্ট এবং এতে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। আর এই যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীন এর বিপরীতে হযরত যয়নব এই গর্ব করতেন যে, তোমাদের বিয়ে তোমাদের ওলীগণ এই পৃথিবীতে পড়িয়েছেন আর আমার বিয়ে ঊর্ধ্বলোকে হয়েছে - এটি থেকেও এই ফলাফলে উপনীত হওয়া সঠিক নয় যে, হযরত যয়নবএর বিবাহের বাহ্যিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয় নি। কেননা বাহ্যিক অনুষ্ঠান হলেও তার এই গর্ব করা যথাযথ যে, তার বিবাহ খোদা তা'লার বিশেষ ইচ্ছায় ঊর্ধ্বলোকে হয়েছে। কিন্তু এর বিপরীতে অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের বিয়ে সাধারণ উপকরণের ভিত্তিতে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) অনুমতি ছাড়াই যয়নবের কাছে গিয়েছিলেন। আর এটি থেকেও এই ফলাফল বের করা হয় যে, তার বিয়ের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয় নি। কিন্তু প্রণিধানে বুঝা যায় যে, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান পালিত হওয়া বা না হওয়ার প্রশ্নের সাথে এ কথারও কোন সম্পর্ক নেই কেননা যদি এর অর্থ এটি হয় যে, মহানবী (সা.) অনুমতি ছাড়াই হযরত যয়নবেরঘরে গিয়েছিলেন তাহলে এটি ভুল এবং ঘটনা বিরোধী কথা হবে। কেননা বুখারীর একান্ত সুস্পষ্ট এবং পরিস্কার রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, বিয়ের পর হযরত যয়নব পৈত্রিক বাড়ি ছেড়ে মহানবী (সা.)-এর ঘরে এসেছিলেন, তিনি (সা.) তার ঘরে যান নি। আর এই রেওয়ায়েতের অর্থ যদি এটি হয়ে থাকে যে, তিনি যখন বাবার বাড়ি ছেড়ে তাঁর (সা.) ঘরে এসে যান তখন তিনি (সা.) বিনা অনুমতিতে তার কাছে গিয়েছেন, তাহলে এটি কোন অস্বাভাবিক ও নিয়মপরিপন্থি কোন বিষয় নয়, কেননা যখন তিনি তাঁর (সা.) স্ত্রী হয়ে তাঁর ঘরে এসে পড়েছেন তখন এমনিতেই তার কাছে তাঁর (সা.) যাওয়ার ছিল, তাঁর (সা.) কোন অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। অতএব অনুমতি না নেওয়া সংক্রান্ত রেওয়ায়েতের এই প্রশ্নের সাথে আদৌ কোন সম্পর্ক নেই যে, তার এই বিয়ের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করা হয়েছিল কি না? আর সত্য কথা হলো, যেমনটি ইবনে হিশাম এর রেওয়ায়েতে সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, খোদা তা'লার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রীতিমত এই বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান করা হয়েছিল আর বিবেকের দাবিও এটিই ছিল যেন এমনটি হয়। কেননা প্রথমত সাধারণ রীতি অনুযায়ী এখানে ব্যতিক্রমের কোন কারণ ছিল না। আর দ্বিতীয়ত এই বিবাহে যেহেতু একটি প্রথার উচ্ছেদ এবং এর প্রভাবকে দূর করা মূল উদ্দেশ্য ছিল, এটি পূর্বের প্রথা ছিল এবং অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত প্রথা ছিল যে, এক পালকপুত্রের স্ত্রীর সাথে বিয়ে হতে পারে না, আর যেহেতু এই প্রথাকে নির্মূল করা ছিল উদ্দেশ্য, তাই এই বিয়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে এবং বহু সাক্ষ্য-প্রমাণের বর্তমানে করা অবশ্যক ছিল যেন পৃথিবীবাসী জানতে পারে যে, এই প্রথার আজ অবসান ঘটেছে।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫৪৩-৫৪৬)

হযরত যায়েদের জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে, হযরত যয়নব সম্পর্কে এবং মহানবী (সা.) এর বিবাহ সম্পর্কেও আমি কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। এটি এজন্য কেননা মহানবী (সা.) এর সাথে হযরত যয়নবের বিয়ে সম্পর্কে আজও আপত্তিকারীরা প্রশ্ন এবং আপত্তি করে থাকে। তাই এ সম্পর্কে আমাদেরও কিছুটা বিস্তারিত জ্ঞান থাকা উচিত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আরো কিছু কথা রয়েছে। হযরত যায়েদ সম্পর্কেও বর্ণনা করার মতো আরো কিছু কথা রয়েছে। এই উভয় বিষয় যতটা বর্ণনা করা প্রয়োজন পরবর্তীতেও আমি বর্ণনা করব। এখন এই ধারাবাহিকতা হযরত যায়েদের বরাতে চলমান আছে।

****

হাদিস

طَلَبُ الْحَلَالِ جِهَادٌ

(বৈধ রিযক সন্ধান করাও এক প্রকার জিহাদ বা সংগ্রাম)

বিশেষ করে বর্তমান যুগে বৈধ উপায়ে আয় উপার্জন করা একটি দূরূহ বিষয়। চোর বাজার, প্রতারণা, ঠগবাজি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ,অপরের অধিকার গ্রাস এবং আত্মসাৎ এমন সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, বৈধ ও অবৈধর মাঝের তফাৎটুকুও অবশিষ্ট নাই। দুধ বিক্রেতা রোযা রেখে দুধে পানি ভেজাল দেয়। অনুরূপভাবে মাসে ১০০ টাকার বেতনধারী কর্মী বিয়ে করা থেকে পালিয়ে বেড়ায় এবং অজুহাত দেয় যে, তার বেতন ৫০০ টাকা হলে বিয়ে করবে। আর সেই সময় পর্যন্ত সে নিজের কামনা-বাসনা পূর্ণ করার জন্য যত প্রকারের অন্যায় পথ অবলম্বন করে শরীয়তে তা সবই অবৈধ।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

নিজ সন্তানদেরকেও সম্মান দেওয়ার রীতি অবলম্বন কর এবং তাদেরকে সর্বোত্তম পন্থায় প্রশিক্ষিত করার চেষ্টা কর।

(ইবনে মাজা, কিতাবুল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Mustafa, Amir Murshidabad District**

ইমামের বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)

দোয়াপ্রার্থী: **Nur Alam, Amir Jalpaiguri District**

মুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'লার নবীগণকে সকল জাতির প্রতি তাদের পথপ্রদর্শন ও সংশোধনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। সমস্ত নবীদের সত্যতার উপর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। আমাদের এও বিশ্বাস, সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পাঠিয়েছেন মানুষকে তাঁর দিকে আহ্বান করতে আর নৈতিকতা শেখাতে। তাঁরা অভিব্যক্তির স্বাধীনতা, ন্যায়-নীতি ও মানুষের প্রতি সহানুভূতি ইত্যাদি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করতেই পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন। এই বিষয়গুলি যদি গভীর দৃষ্টিতে অনুধাবন করা যায় তবে অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকা আমাদের জন্য সম্ভব নয়। এই কারণেই আমরা আহমদী মুসলমানেরা কাউকে যে ঘৃণা করি না, আমাদের এই দাবিতে কোনও প্রকার অতিরঞ্জতা নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়াও আমরা সমগ্র মানবজাতিকে সত্যিকার ভালবাসি আর অপরের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে সব সময় তৎপর থাকি। যেমন, গত বছর এখানে ইহুদী কবরস্থানে হামলা হয়, তাদের কবরগুলির মর্যাদাহানি করা হয়। এই নিন্দনীয় ঘটনার পর জামাত আহমদীয়ার স্থানীয় লোকেরা তাৎক্ষনিকভাবে ইহুদীদের সাহায্যের জন্য ছুটে আসে আর তাদের সঙ্গে একাত্মতা ব্যক্ত করে। কিন্তু এগুলির বিনিময়ে আমাদের কোন পুরস্কার বা কৃতজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না, কেননা, আমরা কেবল সেই শিক্ষামালাই অনুসরণ করি যা আমাদের ধর্ম শিখিয়েছে। সেই শিক্ষা হল, যখন ভিন্ন ধর্ম বা মতবাদের অনুসারীর বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাশে এসে দাঁড়াও।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা সমগ্র মানবজাতির অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা দিচ্ছি যাতে তারা বিদ্বেষ ও বৈষম্যমূলক আচরণ সরিয়ে রেখে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি বিদ্বেষমুক্ত হয়ে পূর্ণ সততার সঙ্গে ইসলামের ইতিহাস অধ্যায়ন করে, তবে সে দেখতে পাবে যে, ধর্মীয় স্বাধীনতাই ইসলামের মূল নীতি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

বস্তুত: আরবের মদীনা শহরে যেখানে রসূল করীম (সা.) বছরের পর বছর জুলুম-অত্যাচার সহন করার অবশেষে নিজ অনুসারীদের সঙ্গে মক্কা থেকে হিজরত করেছিলেন এবং সেখানে তিনি যে শাসনব্যাবস্থা গড়ে তুলেছিলেন তাতে বহুত্ববাদ ও উদারতার বাস্তব রূপায়ন ঘটেছিল। ইসলামের পয়গম্বর অন্যান্য ধর্মের মনীষি এবং সম্প্রদায়ের সঙ্গে একটি সন্ধি স্থাপন করেছিলেন যা এমন এক শহরের ভিত রচনা করতে পেরেছিল যেখানে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ সহাবস্থান করত। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যেন কোন অন্যায় অত্যাচার ছাড়া শান্তি থাকতে পারে এবং স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মীয় সংস্কৃতি মেনে চলতে পারে এই চুক্তি তার নিশ্চয়তা প্রদান করত। এছাড়াও সেযুগের প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজের নিজের ধর্ম বা গোত্রের আইন কানুন মেনে চলতে বাধ্য ছিল। সেই অনুসারে মুসলমানরা ইসলামের শরীয়ত মেনে চলত, ইহুদীরা তওরাত মেনে চলত আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও প্রথার প্রতি অনুগত ছিল। সেই যুগে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং অপরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রতি দায়বদ্ধ ছিল। এই চুক্তি শান্তির প্রসার ঘটিয়েছিল আর এক উদার ও সহনশীল সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠাকে সুনিশ্চিত করেছিল। কাজেই চৌদ্দশত বছর পূর্বে মদীনার মধ্যে বহুত্ববাদ ও বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্বলিত সমাজের উপর ভিত্তি করে এক সফল শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আমি এখানে এমন প্রস্তাব মোটেই দিচ্ছি না যে, বর্তমান কালে সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেকটি জাতির মধ্যে প্রচলিত অগণিত নিয়মকানুন গুলিকে একত্রিত করে দেওয়া হোক। বরং আমি কেবল এতটুকুই বলতে চাইছি যে, আমাদের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত বিশ্ব-মানবতার মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, ন্যায়নীতি , ন্যায় বিচার এবং নৈতিকতার বিকাশের মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য কুরআন করীম ও আঁ হযরত (সা.) অত্যন্ত সুস্পষ্টভাষায় বর্ণনা করেছেন যে, ধর্মীয় বিষয়াদিতে কোন প্রকার বল প্রয়োগ প্রযোজ্য নয়। নিজের ইচ্ছানুসারে যে কোন পথ অবলম্বন করার অধিকার প্রত্যেকের আছে আর ধর্মের সম্পর্ক হল অন্তরের সঙ্গে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অনুরূপভাবে ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, ধর্ম ও মতবিশ্বাসের বিভেদ থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হল শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করা এবং সুনিশ্চিত করা যে, এমন কোন কাজের শরিক হবে না যা সমাজের শান্তি বিনষ্ট করে। ইসলাম বলে, প্রত্যেক ব্যক্তির আইনের প্রতি দায়বদ্ধ হওয়া ও দেশের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়াও তাদের কর্তব্য হল দেশের উন্নতি ও দৃঢ়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা। যদি আপনাদের মধ্যে কারো মনে এই নতুন মসজিদটি নিয়ে কোন প্রকার সংশয় উঁকি মারে আর তাদের মনে এই আশঙ্কা থাকে যে, মুসলমানেরা এই মসজিদটিকে সমাজের বিরুদ্ধে কোন গোপন ষড়যন্ত্র রচনার মাধ্যম বানিয়ে ফেলবে এবং এর দ্বারা সমাজে ঘৃণার প্রসার করবে। তবে আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, এমনভাবে বিচলিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বিশ্বাস রাখুন, এই ভবনটি কেবল ভালবাসা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসার করবে।

এই প্রসঙ্গে আমি সংক্ষিপ্তভাবে মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করছি। মসজিদ নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য হল মুসলমানেরা যেন একত্রিত হয়ে পারস্পরিক প্রেম ও ঐক্যের পরিবেশ তৈরী করে এক খোদার ইবাদত করে। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল মানবজাতির সেবার জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপন করা। প্রত্যেক ইবাদতকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল সমাজের সদস্যদের অধিকার প্রদান করা। কাজেই, একটি প্রকৃত মসজিদ হল ভালবাসা, সহানুভূতি এবং ঐক্যের আবাসস্থল।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইতিহাস এবিষয়ে সাক্ষী দেয় যে, পৃথিবীতে যেখানেই আমরা মসজিদ নির্মাণ করেছি আর যারাই সেখানে ইবাদত করে তারা অন্যান্য নাগরিকদের প্রতি সহানুভূতি, ভালবাসা ও নিষ্ঠায় পূর্বের চেয়ে বেশি উন্নতি করে। আমাদের মসজিদগুলি আহমদীদের সন্ত্রাস বা উগ্রতার বিষয়ে প্ররোচিত করে না, বরং কেবল মানবতার সেবার বিষয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। আর তাদেরকে অপরের প্রতি উদার হতে উৎসাহিত করে। আমাদের মসজিদগুলি সমাজের প্রত্যেক চিন্তাধারার মানুষের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে ও তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার বিষয়ে আমাদের সংকল্পকে আরও দৃঢ়তা দান করে আর সমাজ থেকে সকল প্রকার ঘৃণা, উগ্রতা এবং ভেদাভেদ নির্মূল করতে সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ভ্রাতৃত্ববোধের জন্য এই শহরের সুনাম আছে। আর নিশ্চয় আমাদের এই মসজিদ এই ভ্রাতৃত্ববোধেরই প্রতীক। আমরা এই শহর ও সংলগ্ন অঞ্চলে ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সমন্বয় তৈরী করার উদ্দেশ্যে সমধিক চেষ্টা করব, আমাদের এই সংকল্প মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমেই প্রকাশ পাচ্ছে।

এমন দাবি করা খুবই সহজ কাজ, কিন্তু আমাদের ইতিহাস প্রমাণ করছে যে, এই দাবি কেবল সারবত্তাহীন নয়, বরং সত্যনির্ভর। সব সময় আমাদের চেষ্টা থাকে যে, আমরা যা কিছু প্রচার করি তা নিজেও করে দেখাব। আমি এবিষয়ে আত্মপ্রত্যয়ী যে, অচিরেই স্থানীয় মানুষ স্বীকার করবে, 'বায়তুল আফিয়াত' পুরো সমাজের জন্য প্রকৃত শান্তির কারণ হবে, যার আভিধানিক অর্থই হল 'নিরাপত্তা প্রদানকারী গৃহ'।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এছাড়াও আমি একথাও স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, শান্তি ও মানবতার সেবার জন্য আমাদের সংকল্প সম্পূর্ণত আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার কারণেই।

জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা, যাকে আমরা প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী বলে বিশ্বাস করি, তিনি দাবি করেছেন নিজেকে মহম্মদী মসীহ হিসেবে। অতঃপর বলেছেন, তিনি মূসার পর আগমণকারী মসীহর শান্তিপূর্ণ পথ অনুসরণ করবেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দুটি মহান উদ্দেশ্যসহকারে তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রথম উদ্দেশ্য হল মানবজাতিকে তাদের স্রষ্টার দিকে নিয়ে যাওয়া আর তাঁর অধিকার প্রদান সম্পর্কে মনোযোগ আকর্ষণ করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, মানবীয় মূল্যবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং মানুষের অধিকার প্রদান করা। অতএব প্রত্যেক আহমদী যারা প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর হাতে বয়আত করেছেন, তাদের কর্তব্য হল খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন এবং মানবতার সেবার কোন সুযোগ হাতছাড়া না করা। কুরআন করীম ও আঁ হযরত (সা.) এই শিক্ষাই আমাদেরকে বার বার দিয়েছেন।

সূরা নিসার ৩৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন: "এবং সদয় ব্যবহার কর-পিতামাতার সহিত এবং আত্মীয়-স্বজন এবং এতীম এবং মিসকীন এবং আত্মীয় প্রতিবেশী এবং অনাত্মীয় প্রতিবেশীগণের সহিত এবং সঙ্গী-সহচর এবং পথচারীগণেরর সহিত এবং তোমাদের ডান হাত যাহাদের মালিক হইয়াছে, তাহাদের সহিত। " কুরআন করীমের এই একটি আয়াতই নৈতিকতা ও মানবাধিকারের সমর্থক হওয়ার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এটি শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে আত্মীয়স্বজন এবং মাতাপিতার প্রতি ভালবাসা ও নম্রতাপূর্ণ আচরণ করার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর আদেশ হল সমাজের সব থেকে দুর্বল শ্রেণীকে সঙ্গে নিয়ে চল, যেমন অনাথ বা যারা কোন প্রকারের প্রবঞ্চনার শিকার, তাদের সাহায্য কর। এরপর প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মুসলমানদের এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন প্রতিবেশীদেরকে ভালবাসে, তাদেরকে নিরাপত্তার বিষয়ে যত্নবান হয় আর প্রয়োজনে সব সময় তাদের সাহায্যে তৎপর হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রসঙ্গত একথাও স্মরণ করানো কর্তব্য যে, ইসলামে প্রতিবেশীর পরিভাষা অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। প্রতিবেশী বলতে কেবল তাদেরকেই বোঝানো হয় নি যারা আপনার আশপাশে বসবাস করে, বরং দূরে অবস্থানকারীরা, সফরসঙ্গী, সহকর্মী, অধিনস্ত কর্মী এবং আরও অনেকে এর অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ কুরআন করীম বর্ণনা করেছে যে, মুসলিম শহরে বা গঞ্জে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত। (ক্রমশ:)

যুগ ইমামের বাণী

"তোমাদের আদর্শ সেই সমস্ত মানুষ যাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, কোন ব্যবসা ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর থেকে বাধা দেয় না।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৬)

দোয়া প্রার্থী:

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gouhati)

আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয়

আতাউল মুজিব রাশেদ, লন্ডন

আল্লাহ্ তা'লা এই মানুষকে এই পৃথিবীতে এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যেন সে একজন বান্দা রূপে নিজের জীবন অতিবাহিত করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের জন্য যাবতীয় পন্থা অবলম্বন করে যাতে এই পৃথিবী-রূপী কর্মশালা ত্যাগ করে দারুল জাযা বা পরকালে প্রত্যাবর্তন করার সময় নিজের উদ্দেশ্যে সফল বলে গণ্য হয় এবং ঐশী সন্তুষ্টির চিরন্তন জান্নাতে প্রবেশাধিকার পায়। এই মহান উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য খোদা তা'লা যে সব পন্থা মানুষকে শিখিয়েছেন সেগুলির মধ্যে একটি হল 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ' বা আল্লাহ্‌র পথে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিষ্ঠাসহকারে ব্যয় করা। এই প্রবন্ধে আমি এই বিষয়ের উপর আপনাদের সামনে কিছু কথা তুলে ধরব।

আয়াতে কুরআনীয়াঃ

আল্লাহ্ তা'লা মোমেনদের পথ প্রদর্শনের জন্য কুরআন করীম রূপে যে পূর্ণ শরীয়ত অবতীর্ণ করেছেন এবং যেটিকে মানবজাতির জন্য পথ-প্রদর্শন নামে অভিহিত করা হয়েছে, এবং বিশেষ করে খোদা-ভীরু ব্যক্তিদের জন্য এটি অবশ্যই পথ-প্রদর্শন, কুরআনে প্রত্যেক এমন বিষয় স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যা মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য প্রয়োজন হতে পারে। এই বিষয়গুলির মধ্যে একটি 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ' বা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। যেভাবে এ বিষয়টির গুরুত্ব কুরআন করীমে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে এর গুরুত্ব স্পষ্ট হয়। এবং একথাও জানা যায় যে, এই পথ অবলম্বন করার মাধ্যমেই মানুষ তার জীবনের উদ্দেশ্যে সফল হতে পারে।

কুরআন করীম অধ্যায়ন করলে প্রারম্ভেই যে আয়াতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় সেটি হল-

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

(আল-বাকারা: ৩)

অর্থাৎ এটিই সেই মহান গ্রন্থ যাতে কোন বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই এবং এটি মুত্তাকীদের জন্য পথ-প্রদর্শনের মাধ্যম। এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, মুত্তাকী কারা এবং মানুষ মুত্তাকী কিভাবে হতে পারে? এই দু'টি প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মুত্তাকী তারা, যারা অদৃশ্যের উপর ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং যা কিছু আমরা তাকে দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

এতে মুত্তাকী যাদের চূড়ান্ত পরিণতি হল সফলতা, মূলত তাদের দু'টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যদ্বয় দ্বারা তাদেরকে স্পষ্টরূপে সনাক্ত করা যেতে পারে। আর এই সেই মাধ্যম যার দ্বারা তাকওয়ার পথে পরিচালিত হয়ে মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য অর্জনে সফলতা লাভ করে এবং খোদার প্রিয় ও নৈকট্যভাজন হয়।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা তাকওয়া সন্ধানী এবং তাকওয়ার অসীম ও অনন্ত পথের পথিকদের একটি লক্ষণে একথা বর্ণনা করেছেন যে, তার জীবনের প্রত্যেকটি মূহুর্ত এমনভাবে অতিবাহিত হয় যেন তার মধ্যে (খোদার সত্তায়) বিলীনতার ভাব ফুটে ওঠে। সে এই পরম সত্যকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করে যে, যা কিছু পেয়েছে তা সবই খোদার অনুগ্রহে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এই বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন-

'সব কুছ তেরি আতা হ্যায়, ঘর সে তো কুছ না লায়ে'

অর্থাৎ সবই তো তোমার দান বা অনুগ্রহ, কিছুই তো সঙ্গে করে নিয়ে আসি নি।

নিজেকে এই দৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত করার পর একজন মুমিনের গোটা জীবন এমনভাবে অতিবাহিত হয় যে, সে প্রত্যেকটি বস্তুকে খোদা তা'লার দান হিসেবে বিশ্বাস করে উৎফুল্ল চিত্তে এবং দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে খোদার পথে ব্যয় করে এবং এই ধারা সে আজীবন অব্যাহত রাখে। নিজের প্রাণ, সম্পদ, সময়, সম্মান এবং খোদা প্রদত্ত শক্তি ও সামর্থের প্রতিটি বিন্দু সে খোদার পথে ব্যয় করতে থাকে। সমস্ত কিছু উৎসর্গ করার পরও হৃদয়ের গভীর থেকে সে এই বাণীই শুনতে পায়।

জান দি, দি হুই উসি কি থী। হক তো ইয়েহ হ্যায় কি হক আদা না হুয়া।

অর্থাৎ আমার নিজের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করলাম, কিন্তু সেটিও তাঁরই দান। সত্য কথা এটাই যে, আমি নিজেই কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলাম।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

খোদা সে ওহী লোগ করতে হ্যাঁয় পেয়ার, জো সব কুছ হি করতে হ্যাঁ উসপে নিসার,

উসি ফিক্‌র মেঁ রেহতে হ্যাঁ রোয ও শাব, কি রাজি ওহ দিলদার হোতা হ্যায় কব,

অর্থাৎ খোদাকে তারাই ভালবাসে যারা তাঁর জন্য সমস্ত কিছু উৎসর্গ করে দেয়। এবং সেই প্রিয়তম খোদা কোন উপায়ে সন্তুষ্ট হবে, সেই চিন্তায় দিবারাত্রি মগ্ন থাকে।

ধর্মীয় প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে খোদার পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করার বিষয়ে কুরআন করীমে একাধিক স্থানে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বার বার এবিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, অদৃশ্য দ্রষ্টা খোদা তোমাদের যাবতীয় কুরবানী সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন এবং তিনি হলেন পরম দানশীল খোদা যিনি তোমাদের পুণ্যের প্রতিদান অগণিত হারে দিয়ে থাকেন। এবং তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন, এই প্রতিদান অসীমভাবে বৃদ্ধি করেন।

আল্লাহ্ তা'লা ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহকে জেহাদ ও ব্যবসা নামে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ - تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ- يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ - وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থঃ হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আমি কি তোমাদিগকে এমন এক বানিজ্যের সন্ধান দিব যাহা তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইতে রক্ষা করিবে?

(উহা এই যে) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলে উপর ঈমান আন এবং নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর। ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণজনক যদি তোমরা জ্ঞান রাখ।

(ফলে) তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে প্রবিষ্ট করিবেন এমন জান্নাতসমূহে যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে এবং পবিত্র ও মনোরম আবাসসমূহে চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহের মধ্যে; ইহাই পরম সত্য।

(ইহা ছাড়া) আরও কিছু রহিয়াছে যাহা তোমরা ভালবাস- উহা হইতেছে আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়, সুতরাং মোমেনগণকে সুসংবাদ দাও।

(আস্-সাফ: ১১-১৪)

এই আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পথে ব্যয় করার বরকতের বিষয়ে সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। বস্তুজগতে পাওয়া পুরস্কারসমূহ, ঐশী সাহায্য ও বিজয়ের কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি পরজগতে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি, পাপের ক্ষমা লাভ এবং আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টির চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ দিয়েছেন। স্পষ্টতই, আর্থিক ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার এই সমস্ত কৃপারাজি আল্লাহ্ পথে সংগ্রামকারী ব্যক্তিরা পেয়ে থাকে এবং তাদের আঁচল ইহজাগতিক এবং পরজাগতিক পুরস্কারাজি দ্বারা পূর্ণ থাকে।

এই বিষয়টিকেই অপর একটি আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে-

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ মোমেনগণের নিকট হইতে তাহাদের জীবন এবং তাহাদের ধন-সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন এবং জন্য যে, তাহাদের জন্য জান্নাত আছে।

(আত-তওবা: ১১২)

যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী খোদা তা'লার পক্ষ থেকে নিজের জীবদ্দশাতেই জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করে, সে যে নিজের গন্তব্য পৌঁছে গেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই আয়াতের শেষভাগে আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক ত্যাগ স্বীকারকারী মুজাহিদ বা সংগ্রামকারীদেরকে স্পষ্ট ভাষায় সুসংবাদ দান করেছেন যে, নিজেদের রক্ত ঘাম করে উপার্জিত বৈধ সম্পদ থেকে আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে উৎসর্গকারী! আমি তোমাদেরকে জানাচ্ছি যে,

فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

অতএব তোমরা তোমাদের এই ব্যবসায় খুশী হও, যে ব্যবসা তোমরা তাঁহার সহিত করিয়াছ, এবং উহাই হইতেছে মহা সফলতা।

(আত-তওবা: ১১২)

পরম দয়ালু ও কৃপালু খোদার আমাদের উপর কত বড় অনুগ্রহ যে,

এরপর ১১ পাতায়.....

ইমামের বাণী

"কুরআন শরীফ অনুধাবন করার এবং সেই অনুসারে হিদায়াত পাওয়ার জন্য তাকওয়াই মূল।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)

আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, আমার জুমার খুতবা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং বোঝার চেষ্টা করবেন আর খুতবায় আমার নির্দেশাবলী মেনে চলবেন। এমনটি করলে আপনাদের ঈমান এবং খিলাফত ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় হবে।

সবসময় এই মহান আশীর্বাদকে মূল্য দিবেন এবং সুনিশ্চিত করবেন যে আপনি এবং আপনার ভবিষ্যত প্রজন্ম যেন সব সময় কল্যাণমণ্ডিত খিলাফত থেকে পথপ্রদর্শন, তত্ত্বধান লাভ করে আর খিলাফতের নিরাপত্তার ছায়ায় আশ্রয় লাভ করে।

আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, ক্রমাগত আত্মবিশ্লেষণ করে নিজেদের আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে উন্নত করুন, পুণ্য ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে সব সময় এগিয়ে থাকুন আর নিজের প্রত্যেকটি কাজ সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করুন। আল্লাহ্ তা'লা সকল সৃষ্টির প্রতি, বিশেষরূপে মানুষের সঙ্গে দয়া ও অনুগ্রহের আচরণ করুন। সবসময় নিজেকে একজন আদর্শ-স্থানীয় আহমদী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করুন।

২০১৮ সালের জলসা সালানা মাল্টার আয়োজন উপলক্ষ্যে আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর বিশেষ বার্তা

জামাত আহমদীয়া মাল্টা (ইউরোপ) গত ২রা ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে ২য় বাৎসরিক জলসার আয়োজন করল। জলসাটি আয়োজিত হয় Centru Famil ja Mqaddsa চার্চের একটি সভাকক্ষে। মাননীয় মৌলানা হায়দারআলি যাফর সাহেব,মুবাল্লিগ ও নায়েব আমীর জার্মানীর সভাপতিত্বে প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তিলাওয়াত, নযম এবং হুযুর আনেয়ার (আই.)এর বিশেষ বার্তা উপস্থাপনের পর অধিবেশনের সমাপ্তি ভাষণ রাখেন মৌলানা হায়দার আলি সাহেব। দ্বিতীয় অধিবেশনে Interfaith Session অধিবেশন আয়োজিত হয়। 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' -এর ব্যানারে এই অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয়। তিলাওয়াতের পর মৌলানা হায়দার আলি সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লেখনীর আলোকে শ্রোতাদের সামনে জলসা আয়োজনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। এরপর দেশের রাষ্ট্রপতির বার্তা পড়ে শোনানো হয়। এরপর তিন জন অতিথি তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ভাষণ দান করেন। অধিবেশনের শেষে মাননীয় লায়েক আহমদ আতিফ সাহেব Inter religious peace বিষয়ের উপর বক্তব্য প্রদান করেন। দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘটে। জলসায় উপস্থিতি শ্রোতার সংখ্যা ছিল ৭৫ জন, যাদের মধ্যে ৩৭জন আহমদী, দুইজন অ-আহমদী মুসলিলম এবং ৩৬ জন খৃষ্টান ছিলেন। সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর বিশেষ বার্তা নীচে দেওয়া হল।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

জামাত আহমদীয়া মাল্টার প্রিয় সদস্যবৃন্দ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

আমি একথা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, আপনারা ২রা ডিসেম্বর নিজেদের বাৎসরিক জলসার আয়োজন করছেন। আমার দোয়া হল আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের এই জলসাকে মহান সফলতা দান করুন আর জলসায় অংশগ্রহণকারীদেরকে এই অনন্য ধর্মীয় সমাবেশ থেকে আধ্যাত্মিকভাবে কল্যাণমণ্ডিত করুন ও এর থেকে অশেষ বরকত অর্জনকারী হওয়ার তৌফিক দান করুন।

আমি খুতবায় বারংবার এবিষয়ের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে এসেছি যে, আমাদেরকে প্রকৃত আহমদী মুসলমান হতে গেলে ক্রমাগত সংগ্রাম করে যেতে হবে এবং বয়আতের শর্তাবলীকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করার চেষ্টা করতে হবে যার অঙ্গীকার আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাতে করেছি, যাঁকে আঁ হযরত (সা.)-'আমাদের মাহদী' -এর স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণে ভূষিত করেছেন।

এর সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

এই সেলসেলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমার সঙ্গে ভক্তিপূর্ণ সম্পর্ক রাখা আর আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করার উদ্দেশ্য হল,তারা যেন পুণ্যকর্ম ও তাকওয়ার উচ্চমার্গে উপনীত হয়। তাদের কর্মে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা না দেয় বা কুপ্রবৃত্তি তাদের কাছে না ঘেঁষে। তারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি নিয়মনিষ্ঠ হয়, মিথ্যা কথা না বলে, কাউকে মুখের কথা দ্বারা আঘাত না করে। তারা যেন কোন প্রকার কুকর্মে লিপ্ত না হয়, কোন প্রকার অত্যাচার, বিশৃঙ্খলার চিন্তাও যেন তাদের মনে উঁকি না দেয়। মোটকথা, যাবতীয় প্রকারের পাপ ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ, রিপুর তাড়না ও অযথা কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে। আর খোদার পবিত্র, বিনম্র ও নিরীহ বান্দায় পরিণত হয় আর কোন বিষাক্ত উপাদান তার অস্তিত্বে যেন অবশিষ্ট না থাকে।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬-৪৭)

কাজেই কেবল ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তন করাই যথেষ্ট নয়, বরং একজন উন্নত ও নিষ্ঠাবান আহমদী হতে গেলে নিজের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ প্রয়োগ করে বয়আতের শর্তাবলীর উপর আমল করা জরুরী। বয়আতের অর্থ হল নিজেকে খোদার কাছে বিক্রি করে দেওয়া। আর যে ব্যক্তি বয়আতের অঙ্গীকার করে, তার উচিত বিনয় অবলম্বন করা এবং নিজেকে আত্ম-অহংকার থেকে সম্পূর্ণত পৃথক করে নেওয়া। বয়আতের অর্থ হল ঐশী আদেশাবলীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করা। যদি কোন ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে এমনটি করে, তবে আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যক্তিকে ধ্বংস করেন না, সকল দিক থেকে তিনি তাকে রক্ষা করেন।

আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, ক্রমাগত আত্মবিশ্লেষণ করে নিজেদের আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে উন্নত করুন, পুণ্য ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে সব সময় এগিয়ে থাকুন আর নিজের প্রত্যেকটি কাজ সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করুন। আল্লাহ্ তা'লার সকল সৃষ্টির প্রতি, বিশেষরূপে মানুষের সঙ্গে দয়া ও অনুগ্রহের আচরণ করুন। সবসময় নিজেকে একজন আদর্শ-স্থানীয় আহমদী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করুন।

আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, আমার জুমার খুতবা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং বোঝার চেষ্টা করবেন আর খুতবায় দেওয়া আমার নির্দেশাবলী মেনে চলবেন। এমনটি করলে আপনাদের ঈমান এবং খিলাফত ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় হবে। এই যুগে ইসলামের পুনরুজ্জীবন এবং বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা কেবল খিলাফত ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার মাধ্যমেই সম্ভব। অতএব, সবসময় এই মহান আশীর্বাদকে মূল্য দিবেন এবং সুনিশ্চিত করবেন যে আপনি এবং আপনার ভবিষ্যত প্রজন্ম যেন সব সময় কল্যাণমণ্ডিত খিলাফত থেকে পথপ্রদর্শন, তত্ত্বধান লাভ করে আর খিলাফতের নিরাপত্তার ছায়ায় আশ্রয় লাভ করে।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের জলসাকে মহান সফলতা দান করুন আর আপনাদেরকে বয়আতের শর্ত মান্যকারী হওয়ার তৌফিক দান করুন। আর তিনি যেন আপনাদেরকে এও তৌফিক দান করেন যে, আপনারা নিজেদের জীবনে এক প্রকৃত বিপ্লব সাধনকারী হন আর পবিত্রতা, পুণ্যকর্ম, ইসলাম সেবা এবং মানবতার সেবার ক্ষেত্রে ক্রমাগত উন্নতি করতে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের উপর অশেষ কৃপা করুন।

ওয়াসসালাম খাকসার

মির্যা মসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল খামিস

ইমামের বাণী

" ইসলাম প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান দান করে যা মানুষের পাপময় জীবনের উপর মৃত্য নিয়ে আসে "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali, Amir Birbhum District

তিনিই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাদের জীবন দান করেছেন এবং তাঁরই প্রদত্ত শক্তি ও সামর্থ্য দ্বারা আমরা উপার্জন করছি। তাঁরই কৃপা ও অনুগ্রহে উপার্জিত সম্পদের একাংশ যখন তাঁর উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়, তখন সেই রিযিক দাতা প্রীত হয়ে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, একজন মোমিনের জন্য এর থেকে বড় কোন পুরস্কার নেই যাকে ফউযে আযীম বা মহান সফলতা বলা যেতে পারে।

খোদার পথে ব্যয় করা এবং এই পথে অলসতা বা অবহেলা করা থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'লা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন তিনি বলেন-

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ط وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

অর্থঃ হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আমরা তোমাদিগকে যে রিযিক দান করিয়াছি উহা হইতে খরচ কর সেই দিন আসিবার পূর্বে যেদিন কোন ক্রয়-বিক্রয় এবং বন্ধুত্ব এবং শাফায়াত (সুপারিশ) চলিবে না; বস্তুত কাফেরগণই যালেম।

(আল-বাকারা: ২৫৬)

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, খোদার পথে যারা ব্যয় করে না আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অত্যাচারী আখ্যায়িত করেছেন। স্পষ্টতই, পরকালে যে মহান সফলতা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার তুলনায় পৃথিবীর অস্থায়ী আনন্দ ও সাচ্ছন্দকে প্রাধান্যদানকারীরা চরম পর্যায়ের অত্যাচারী ছাড়া কিছুই নয়।

হাদীস:

কুরআনী আয়াতের পর আসুন আমরা হাদীসের আলোকে এ বিষয়ে পথ-প্রদর্শন গ্রহণ করি। আঁ হযরত (সা.) এমন এক উম্মী (নিরক্ষর) নবী ছিলেন যিনি কারো কাছ থেকে শিক্ষার্জন করেন নি, বরং তিনি স্বয়ং খোদা তা'লাই ছিলেন তাঁর শিক্ষক। আল্লাহ্ তা'লা তাকে সেই তত্ত্বজ্ঞান দান করেছিলেন যার কারণে তিনি সমগ্র জগতের পথ-প্রদর্শক হয়ে থাকলেন। আর্থিক কুরবানীর বিষয়েও তিনি (সা.) তাঁর জাতিকে বেনজির ভাবে পথ দেখিয়েছেন। এবিষয়ে তাঁর কয়েকটি নির্দেশ নমুনা হিসেবে তুলে ধরা হল।

* একটি হাদিসে কুদুসীতে বর্ণিত আছে, ' হে আদম সন্তান! তুমি খোদা তা'লার পথে উদার মনে ব্যয় কর। আল্লাহ্ তা'লাও তোমার জন্য ব্যয় করবেন।' (মুসলিম, কিতাবুয যাকাত)

তিনি (সা.) বলেন- ' সেই ব্যক্তি ঈর্ষণীয় যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দান করেছেন এবং তা উপযুক্ত স্থানে ব্যয় করার জন্য অসাধারণ শক্তি ও সাহস দান করেছেন।'

(বুখারী, কিতাবুয যাকাত)

তিনি (সা.) বলেন- " সেই ধনী নয় যার কাছে বেশি সম্পদ আছে, বরং প্রকৃত সম্পদশালী সেই যে মনের দিক থেকে ধনী। অর্থাৎ খোদার পথে উদার মনে ব্যয় করে।"

(তিরমিযি, আবওয়াবুয যোহদ)

তিনি (সা.) বলেন- " যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে কিছু ব্যয় করে, সে প্রতিদানে সাতশো গুণ বেশি পেয়ে থাকে।"(তিরমিযি, বাবুল ফযল)

"পুণ্যের সকল দ্বারের মধ্যে সবশ্রেষ্ঠ দ্বার হল সদকা-খয়রাত করা"

(আল-মুআজামুল কাবীর)

" প্রত্যহ সকালে দু'জন ফিরিশ্তা নাযেল হন। তাদের মধ্যে একজন বলেন, হে আল্লাহ্ ! খোদার পথে দানকারীদের উত্তম প্রতিদান দাও এবং তার পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের আরেকটি দল তৈরী কর। এবং দ্বিতীয় ফিরিশ্তা বলেন, হে আল্লাহ্! সম্পদ আটককারীদের জন্য ধ্বংস নির্ধারণ কর।" (বুখারী, কিতাবুয যাকাত)

"তোমাদের প্রকৃত সম্পদ সেটিই যেটি তোমরা খোদার পথে ব্যয় করে আগে প্রেরণ করেছ। যা পেছনে থেকে যায় তা হল উত্তরাধিকারদের সম্পদ।"

(মুসলিম, কিতাবুয যাকাত)

যারা পুণ্যবান সন্তানের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকে তাদের জন্য এই হাদীসটি মহান উপদেশ হিসেবে গণ্য হবে।

" মুসলমান ব্যক্তির দান-খয়রাত করা তাকে দীর্ঘজীবি করে তোলে এবং অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে।"

(কুনযুল আমাল,হাদীস নম্বর-১৬০৬২)

" প্রত্যেক জাতির জন্য একটি পরীক্ষা থাকে। আমার জাতির জন্য পরীক্ষা সম্পদের বিষয়ে।"

(তিরমিযি, কিতাবুয যোহদ)

" আল্লাহ্র পথে মেপে খরচ করো না। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'লাও তোমাদেরকে মেপে মেপে দান করবেন। কার্পণ্যতা বশতঃ নিজের টাকার থলির মুখ বন্ধ করে রেখ না, নচেত তা চিরতরে বন্ধই থেকে যাবে। সামর্থ্য অনুযায়ী উদার মনে খরচ কর।"

(বুখারী, কিতাবুয যাকাত)

কুরআন মজীদ ও আহাদীস থেকে প্রদত্ত এই পথ প্রদর্শন এই সত্যকে স্পষ্টরূপে উন্মোচন করে যে, ধর্মের প্রয়োজনে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করার একটি অব্যর্থ উপায়। আর্থিক কুরবানী করার ফলে একদিকে ত্যাগ স্বীকারকারীরা খোদার তা'লার ভালবাসা অর্জন করে, অপরদিকে দয়ালু খোদা তা'লা এমন নিষ্ঠাবানদেরকে এই পৃথিবীতেই অশেষ দানে ভুষিত করে থাকেন। তাদের সমস্যা ও বিপদাপদকে দূর করে দেন। তাদের জীবনকে আশিসমন্ডিত করে তোলেন এবং এই পৃথিবীকেই তাদের জন্য জান্নাত সদৃশ বানিয়ে দেন। খোদা তা'লা স্বয়ং তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও চাহিদাপুরণকারী হয়ে ওঠেন। আর্থিক ত্যাগ স্বীকারকারীদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা পরকালে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হওয়া সম্ভব নয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী:

সৈয়্যাদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর লেখনী এবং মালফুযাতে খোদা তা'লার পথে ব্যয় করার বিষয়ে সবিস্তারে আলোকপাত করেছেন এবং বার বার নিজের অনুসারীদেরকে এর গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত করেছেন এবং এই পথে ক্রমশঃ উন্নতি করার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর সেই অমূল্য উপদেশাবলী থেকে কয়েকটি আপনাদের সামনে তুলে ধরা হল।

তত্ত্বজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার প্রভাবের দিক থেকে এই উপদেশবাণীসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। কেবল প্রয়োজন শুধু এই মহান বাণীকে অন্তরে স্থান দেওয়ার। তিনি (আ.) বলেন-

" প্রকৃত ইসলাম হল আল্লাহ্ তা'লার পথে যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ্যকে আজীবন উৎসর্গ করে যাওয়া, যাতে মানুষ পবিত্র জীবনের উত্তরাধিকারী হয়।"

(আল-হাকাম, ১৬ আগস্ট, ১৯০০)

" প্রকৃত রিয্কদাতা হলেন খোদা তা'লা। যে ব্যক্তি তাঁর উপর আস্থা রাখে সে কখনো রিযিক থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না। তিনি যাবতীয় উপায়ে এবং যে কোন স্থান থেকে তাঁর উপর আস্থা স্থাপনকারী ব্যক্তির জন্য রিযিক পৌঁছে দেন। খোদা তা'লা বলেন, যে আমার উপর আস্থা রাখে আমি তার প্রতি আকাশ থেকে রিযিক বর্ষণ করি এবং তার পায়ের নিচে থেকে বের করি। অতএব প্রত্যেকের খোদা তা'লার উপর ভরসা করা উচিত।

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬০)

" যে ব্যক্তি জরুরী উদ্যোগে অর্থ ব্যয় করে, আমি আশা করি, সেই অর্থ ব্যয়ের কারণে তার সম্পদ কমে যাবে না। উপরন্তু তার সম্পদে বরকত হবে। অতএব খোদা তা'লার উপর ভরসা রেখে পূর্ণ নিষ্ঠা, উদ্যম ও সাহসিকতার পরিচয় দিন, কেননা, সেবা করার জন্য এটিই সময়। এরপর সেই সময় আসন্ন যখন পর্বত সমান সোনাও তাঁর পথে খরচ করা হলে এই সময়ের অর্থের সমতূল্য হবে না.....। এবং খোদা তা'লা নিরন্তর একথা প্রকাশ করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তিকেই এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হবে যে নিজের প্রিয় সম্পদকে এই পথে ব্যয় করবে।

একথা স্পষ্ট যে, তোমরা দু'টি জিনিসকে একত্রে ভালবাসতে পার না। তোমরা সম্পদকেও ভালবাসবে আবার খোদা তা'লাকেও ভালবাসবে, এমনটি সম্ভব নয়। কেবল একটিকে ভালবাসতে পার। অতএব সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে, খোদা তা'লাকে ভালবাসে। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ খোদাকে ভালবেসে তাঁর পথে খরচ করে, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার সম্পদে অন্যদের তুলনায় বেশি বরকত দেওয়া হবে। কেননা, সম্পদ নিজে থেকে আসে না, বরং খোদার ইচ্ছায় আসে। অতএব যে ব্যক্তি খোদার জন্য সম্পদের কিয়দংশ ত্যাগ করে সে অবশ্যই তার প্রতিদান পাবে।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

'সর্বদা সত্য বল, যখন তোমার কাছে কোন গচ্ছিত সম্পদ রাখা হয়, তখন তা আত্মসাৎ করো না আর সর্বদা প্রতিবেশীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।"

(বাইহাকি, ফি শোয়েবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

যুগ খলীফার বাণী

যদি তোমরা ইহকাল ও পরকালের সফলতা এবং মানুষের মন জয় করতে চাও, তবে পবিত্রতা অবলম্বন কর, নিজেকে পরিছন্ন রাখ এবং নিজের উত্তম আচরণের নমুনা প্রদর্শন কর। তবেই তোমরা সফলকাম হবে।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১লা জানুয়ারী, ২০১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Jamat AhmadiyyaBilaspur (Chhattisgarh)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 18 July, 2019 Issue No.29

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

কিন্তু যে ব্যক্তি সম্পদকে ভালবেসে খোদার পথে সেই খেদমত করে না যা করা উচিত, তবে সে সম্পদ হারিয়ে বসবে।

এমন ধারণা করে বসো না যে, সম্পদ তোমাদের চেষ্টায় আসে, বরং তা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আসে। একথা মনে করো না যে, সম্পদের কিয়দংশ দান করে বা অন্য কোন উপায়ে সেবা করে তোমরা খোদা তা'লা এবং তাঁর রসূলের উপর অনুগ্রহ করছ। বরং এটি তাঁর অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদেরকে এই সেবার জন্য আহ্বান করেন।..... আমি বারংবার তোমাদেরকে বলি যে, খোদা তা'লা তোমাদের খিদমতের বিন্দুমাত্র মুখাপেক্ষী নন। উপরন্তু তোমাদেরকে তিনি খিদমতের সুযোগ দান করে কৃপা করেন। "

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৯৭-৪৯৮)

" আমি নিশ্চিতরূপে মনে করি যে, কার্পণ্য এবং ঈমান একই অন্তরে একত্রিত হতে পারে না। যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সঙ্গে খোদার উপর ঈমান আনে, সে কেবল সেই সম্পদটুকুকেই নিজের সম্পদ বলে মনে করে না যা তার সিন্দুকে রক্ষিত আছে, বরং সে খোদা তা'লার সমস্ত ধন-ভাণ্ডারকে নিজের ধন-ভাণ্ডার মনে করে এবং তার কার্পণ্য সেইভাবে দূর হয় যেভাবে আলোর মাধ্যমে অন্ধকার দূর হয়। .... যদি তোমরা কোন পুণ্যকর্ম কর এবং এখন কোন সেবা কর তবে নিজেদের বিশ্বস্ততার উপর মোহর লাগিয়ে নিবে। তোমাদের আয়ু বেড়ে যাবে এবং ধন-সম্পদে বরকত দেওয়া হবে।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৯৮)

" আমার কাছে আজ সব থেকে বড় প্রয়োজন হল ইসলামের জীবন। ইসলাম যাবতীয় প্রকারের সেবার মুখাপেক্ষী। ইসলামের প্রয়োজনীয়তার উপর আমরা কোন কিছুকে প্রাধান্য দিতে পারি না। আজকে সব থেকে বড় প্রয়োজন হল যথাসম্ভব ইসলামের সেবা করা এবং ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য অর্থ ব্যয় করা। "

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩২৭)

" প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজেকে বয়াতের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে, তার জন্য সময় এসেছে নিজের সম্পদ দ্বারা এই জামাতের সেবা করা।.... বয়াতকারী প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত সামর্থ্যানুযায়ী সাহায্য করা যাতে খোদাও তাদেরকে সাহায্য করেন। প্রত্যেক ব্যক্তির নিষ্ঠার পরিচয় তার সেবা দ্বারা পাওয়া যায়। হে প্রিয়জনেরা! এখন সময় হয়েছে ধর্মের জন্য এবং ধর্মের উদ্দেশ্যে সেবা করার। এই সময়টিকে সৌভাগ্যের কারণ বলে মনে কর, কেননা এমন সুযোগ পরে আর আসবে না।"

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৩)

" ধন-সম্পদকে ভালবেসে ফেল না। কেননা, একটি সময় আসবে যখন সম্পদকে না ছাড়তে চাইলেও সম্পদ নিজেই তোমাকে ছেড়ে দিবে। "

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩১৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন:

" এই যুগে, যেটি হযরতম মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগ, একটি জিহাদ হল আর্থিক কুরবানীর সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। কেননা এটি ছাড়া ইসলামের প্রতিরক্ষায় পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করা, বিভিন্ন ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ, এই পুস্তক-পুস্তিকাগুলিকে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেওয়া, মিশন তৈরী করা, মুরুব্বী তৈরা করে তাদেরকে জামাতে পাঠানো, মসজিদ নির্মাণ, স্কুল কলেজের মাধ্যমে দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, হাসপাতাল তৈরী করে মানবতার সেবা-এসব কিছুই সম্ভব নয়। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত না পৃথিবীর সর্বত্র প্রত্যেকটি ব্যক্তির কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে যায় এবং দরিদ্রদের চাহিদাবলী পুরণ করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই আর্থিক জিহাদ অব্যাহত থাকবে এবং নিজের সামর্থ অনুযায়ী এই জিহাদে অংশ নেওয়া প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ৩১ শে মার্চ, ২০০৬)

নিকাহ্‌র জন্য ওলীর অনুমতি অনিবার্য

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) খুতবা জুমআ প্রদত্ত ৮ই এপ্রিল ২০১৬ তারিখে বলেন-

" বিবাহ সম্পর্কে এই বিষয়টি মেয়েদের জন্যও স্পষ্ট হওয়া জরুরী যে, যদিও সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে মেয়ের পছন্দকেও স্থান দেওয়া উচিত এবং মহানবী (সা.) মেয়ের পছন্দকে মর্যাদা দিয়েছেন, কিন্তু ইসলাম এ বিষয়টিকেও মেনে চলতে বাধ্য করে যে, ওলীর অনুমতি ব্যতীত নিকাহ্ বৈধ নয়।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন- " আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে প্রেরণ করেছেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর পক্ষ থেকেই। আমাদের শরীয়ত বলে (অর্থাৎ ইসলামের শরীয়ত একথাই বলে) যে, কিছু ক্ষেত্রে শরিয়ত নির্ধারিত ব্যতিক্রম ছাড়া ওলীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন নিকাহ বৈধ নয়। যদি এমন কোন নিকাহ হয়ে থাকে তা অবৈধ ও অসম্পূর্ণ বলে গণ্য হবে। এমন মানুষদেরকে বোঝানো আমদের কর্তব্য। যদি তারা না বোঝে তবে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করুন।"

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগেও অনেক সময় এধরণের ঘটনা ঘটেছে। এক যুবতী এক ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ করার বাসনা করে, কিন্তু তার পিতা অস্বীকৃতি জানায়। তারা দুজনে (কাদিয়ান নিকটস্থ স্থান) নঙ্গল এসে কোন মোল্লার কাছে নিকাহ পড়িয়ে নেয় এবং তাদের বিয়ে হয়ে গেছে বলে প্রচার করে বেড়ায়। এরপর তারা কাদিয়ান আসে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এ সংবাদ প্রাপ্ত হলে তাদের উভয়কে কাদিয়ান থেকে বহিষ্কার করেন এবং বলেন কেবল মেয়ের সম্মতি নিয়ে ওলীর অনুমতি ছাড়া নিকাহ পড়ানো শরীয়ত বহির্ভূত কর্ম। সেখানেও মেয়ে সম্মত ছিল এবং বলছিল যে, এই যুবকের সঙ্গে বিয়ে করব, কিন্তু তারা যেহেতু ওলীর অনুমতি ছাড়া নিকাহ পড়িয়েছিল এই কারণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাদেরকে কাদিয়ান থেকে বের করে দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে (কাদিয়ানে সেই যুগে হযরত মুসলেহ মওউদ-এর যুগেও এমন একটি নিকাহ পড়ানো হয়েছিল। তিনি বলেন) এই নিকাহটিও অবৈধ। তার মা-কেও আমি একথাই বলেছি। (ছেলের মাকে বলেছিল। একজন মহিলা এসে বলছিল যে, যেহেতু মেয়ে রাজি ছিল তাই আমার ছেলে নিকাহ করেছে। এতে কিসের এত বিপত্তি?) তিনি (রা.) বলেন, আমি তাকে বলেছি যে, তুমি তোমার ছেলের জন্য পাত্রী পেয়েছ তাই বলছ যে, মেয়ে যেহেতু রাজি আছে তবে ওলীর সম্মতির প্রয়োজন কি? কিন্তু তোমারও তো মেয়ে আছে। যদি তাদের বিয়ে হয়ে থাকে তবে তাদেরও হয়তো মেয়ে আছে। তাদের মধ্য থেকে কোন মেয়ে এরকমভাবে কোন পর পুরুষের সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে যাক- এটি কি তুমি পছন্দ করবে?"

(খুতবাতে মাহমুদ, ১৮তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৭৫-১৭৬ থেকে সংকলিত)

অতএব যেরূপ পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে যে, পিতা-মাতাকেও কোন বৈধ কারণ ছাড়া মিথ্যা আত্মাভিমানের নামে সম্পর্ক না করার হঠকারিতা দেখানো উচিত নয় যার ফলে হত্যার মত নৃশংস অপরাধ না করে বসে। মেয়েদেরকেও ইসলাম ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আদালতে বা কোন মৌলবীর কাছে বিয়ে করার বা নিকাহ পড়ানোর অনুমতি দেয় না। যদি কোন বাধ্যবাধকতার পরিস্থিতি দেখা যায় তবে মেয়ে খলীফায়ে ওয়াক্তের কাছে পত্র লিখতে পারে, যিনি পরিস্থিতি অনুসারে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। অতএব ছেলে ও মেয়ে উভয়ই যদি ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার নীতিকে সামনে রাখে তবে খোদা তা'লাও কৃপা করবেন।"

****

যুগ খলীফার বাণী

"জগত অর্জনের ক্ষেত্রে ধর্মই যেন প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে আর এমনভাবে জগত অর্জন করা উচিত যাতে তা ধর্মের সেবক হয়।"

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ৫ই মে, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

যুগ ইমামের বাণী

"আমি জনাব খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর নবুয়তের অনুরাগী। যে ব্যক্তি 'খতমে নবুয়ত'-এর অস্বীকারকারী, আমি মনে করি সে ইসলামের গন্ডি থেকে বেরিয়ে গেছে।"

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Kibria and Family, Jamat Ahmadiyya Santoshpur**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir